ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৫

সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক: সমাজ সচেতনা ও শিল্পসাফল্য

*অনুপম হাসান

সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশের সাহিত্যে সৈয়দ শামসুল হক কাব্যনাটক রচনায় অগ্রণী শিল্পী। কাব্যনাটক রচনার পাশাপাশি তিনি সেগুলোর সফল মঞ্চায়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন; পরিণামে কবিতা ও নাটকের সমন্বিত এই শিল্পমাধ্যমের সফলতা মঞ্চায়নের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়। সৈয়দ হকের কাব্যনাটকগুলোর সফল মঞ্চায়ন তাঁকে কাব্যনাট্যকার হিসেবে বাংলাদেশের সাহিত্যে মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। যদিও সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যজীবনের শুরু গল্প রচনার মাধ্যমে তথাপি পরবর্তীকালে কবিতা ও নাটকের সমন্বিত মিশ্রণে কাব্যনাটক রচনা করে বাংলাদেশের সাহিত্যে তিনি ঈর্ষণীয় সাফল্য পেয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনা কাব্যনাটকের সঠিক উপাদান না হলেও তিনি তা কাব্যনাটকের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে মঞ্চসফল কাব্যনাটক রচনা করেছেন। কাব্যনাটকের মূল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে লেখক আধুনিক ব্যক্তিমানুষের অন্তর্গত যে সংকট-সমস্যা এবং জটিল চিন্তাচেতনার কথা এবং সমাজবাস্তবতার চিত্র তুলে ধরেছেন তা আলোচ্য প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হয়েছে।

ভূমিকা:

বাংলা কাব্যনাটকের ইতিহাস সুদীর্ঘ না হলেও মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে নাট্যসাহিত্যের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় এবং তাঁর উত্তরসূরীদের নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে কাব্যনাটকের চর্চা চলে। ইউরোপে যেরকম বাস্তববাদী নাটকের বিরুদ্ধে অভিনব নাট্যাঙ্গিকের অন্বেষণে কাব্যনাট্যের সৃষ্টি হয়েছিল, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তদ্রূপ ঘটনা না ঘটলেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বভাবজ সাহিত্যের অভিনব আঙ্গিক অনুসন্ধিৎসায় বাংলা কাব্যনাটকের জন্ম। তাঁর একক প্রচেষ্টায় বাংলা কাব্যনাটক অনেকটা পথ অতিক্রম করলেও আধুনিক কাব্যনাটকের সকল উপাদান তাঁর রচনায় পাওয়া যায় না। তবে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট সাহিত্যের এই অভিনব শাখা পরবর্তীতে মোহিতলাল মজুমদার, জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত, সুশীল রায়, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকগণের একান্ত প্রচেষ্টায় বাংলা কাব্যনাটকের প্রাথমিক ভিত্তিভূমি তৈরি হয়। এই ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে পরবর্তীকালে ষাট, সত্তর দশকে বাংলা সাহিত্যেও কাব্যনাট্যের ইউরোপীয় আঙ্গিক ও তাত্ত্বিকতা আত্মস্থ করে, কবি-নাট্যকারগণ আধুনিক-অর্থে সার্থক বাংলা কাব্যনাটক রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে ষাট-সত্তরের দশকে যেভাবে কাব্যনাট্যচর্চা আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল, বাংলাদেশের সাহিত্যে তদ্রূপ হয়নি। বাংলাদেশের সাহিত্যে কেন পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় কাব্যনাট্যচর্চা হয়নি, তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। তবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) কাব্যনাটক রচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি শুধুমাত্র কাব্যনাটক রচনা করেননি, পাশাপাশি তাঁর রচিত কাব্যনাটকের মঞ্চসাফল্য বাংলাদেশের সাহিত্যে কাব্যনাটক শাখা জনপ্রিয়তা লাভ করে। সৈয়দ শামসুল হক বিরল

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহ্ মখদুম কলেজ, রাজশাহী

প্রতিভাসম্পন্ন লেখক। তিনি একাধারে কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, গল্পকার হিসেবে খ্যাতিমান। এক কথায় বলা যায়, সৈয়দ শামসুল হক 'সব্যসাচী' লেখক। তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরু গল্প রচনার মাধ্যমে, কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি সাহিত্যের একাধিক মাধ্যমে সাফল্যের সঙ্গে বিচরণ করেছেন। কবিতা ও নাটকের মিশ্রণে কাব্যনাটক রচনা করেও সৈয়দ শামসুল হক ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করেছেন। তিনি ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনাকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে যেমন সফল কাব্যনাটক রচনা করেছেন, তেমনি আধুনিক কালের ব্যক্তি মানুষের অন্তর্গত সমস্যা সংকট ও জটিল চিন্তাচেতনাও কাব্যনাট্যাঙ্গিকে সাফল্যের সাথে উপস্থাপন করেছেন।

এক. যুদ্ধ ও নারীর বিপর্যয়

সৈয়দ শামসুল হক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৫) কাব্যনাটক রচনা করেন মুক্তিযুদ্ধে প্রেক্ষাপটে। এটিই তাঁর প্রথম কাব্যনাটক। মূলত *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*-এর মাধ্যমে তিনি কাব্যাঙ্গিকে নাট্যনিরীক্ষা করেন। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে সৈয়দ হক লন্ডনের প্রবাসজীবনে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* কাব্যনাটক রচনা করেন। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এবং দেশকে পাকিস্তানী শাসন শোষণের কবল থেকে মুক্ত করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে নিজেদের স্থান করে নেয়। সৈয়দ শামসুল হক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* কাব্যনাটকে বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশে একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ায় সংঘটিত যুদ্ধের পটভূমিতে অসংখ্য বেদনাদায়ক ঘটনার মধ্য থেকে একটি গ্রামের কতিপয় মানুষের যুদ্ধকালীন ভূমিকার ওপর ভিত্তি করে এ কাব্যনাটকের কাহিনী নির্মাণ করেছেন। একটি গ্রামের যুদ্ধকালীন বাস্তবতায় নাট্যকার দেশের সামগ্রিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় কাব্যনাটকের কাহিনী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক। নাট্যকাহিনীর অভ্যন্তরে গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে বোঝা যায়, কাব্যনাটকে বিভিন্ন চরিত্রের মনোবিশ্লেষণে নাট্যকার অধিকতর যত্নশীল ছিলেন। কাব্যনাটকের তাত্ত্বিক বিষয় সম্বন্ধে সৈয়দ শামসুল হকের মৌলিক ধারণা স্পষ্ট থাকায়, রাজনৈতিক ঘটনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করেও তাঁর পক্ষে কাব্যনাটক রচনা করা সম্ভব হয়েছে। কাব্যনাটকে দর্শক শুধুমাত্র নাট্যঘটনা দেখার প্রত্যাশা করে না, নাট্যকাহিনীর সাথে সাথে কাব্যনাটকের ক্ষেত্রে আরো গভীর কিছু উপলব্ধি করতে, জানতে এবং শুনতে চায়; যা তাদের যুক্তি বুদ্ধি বিবেকের গভীরতম প্রদেশে নাড়া দেবে। কবিতার মতোই কাব্যনাটকও জীবনের সামগ্রিকতা স্পর্শ করতে উদ্যত বলেই 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাটকে সৈয়দ হক মুক্তিযুদ্ধের মতো রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের নেপথ্যে পিতৃহৃদয়ের মর্মস্পর্শী যন্ত্রণা তুলে ধরেছেন। এ কাব্যনাটকের ঘটনার মধ্য দিয়ে সৈয়দ হক দেখিয়েছেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে কীভাবে সম্পৃক্ত ছিল।[১]

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় কাব্যনাটকের কাহিনী আটষট্টিহাজার গ্রামবাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম 'সতেরো গ্রাম'। এ গ্রামের অধিবাসীরা গ্রামের মাতবরের নির্দেশে পাকিস্তানী মিলিটারিদের প্রাথমিক পর্যায়ে সহায়তা করে; কিন্তু মুক্তিবাহিনীর ক্রমাগত সাফল্যে তারা ভীত হয়ে মাতবরের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে অনেকটা ব্যর্থ হলে তাদের সঙ্গে থাকা যুবকদল

জোরাল প্রতিবাদের উষ্মা প্রকাশ পায়। গ্রামবাসী একাত্তরের যুদ্ধকালীন বাস্তবতায় তাদের রক্ষাকর্তা মনে করে মাতবরের নিকট উপস্থিত হয়।[২] গ্রামবাসী মাতবরের নিকট তাদের উৎকণ্ঠার কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে এবং এই সমূহ বিপদ থেকে তাদেরকে রক্ষার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে। গ্রামবাসীর সংকটকালে মাতবর সহজে দেখা দেয় না; মাতবরের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মুক্তিবাহিনীর এই প্রতিরোধ সুসংগঠিত পাকিস্তানী সৈন্যের সামনে খুব অসহায় হয়ে পড়বে কিংবা মোকাবিলা করতে পারবে না। এজন্য সে অনেকটা গর্বভরে গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলে :

আরো শোনো, উড়া জাহাজের ঝাঁক ১০/২০/২৫ হাজার
চক্কর দিতাছে তারা, যদি বোমা মারে একবার
পিঁপড়ার মতো মারা যাবে মুক্তিবাহিনী তোমার।[৩]

মাতবরের একথার পর গ্রামবাসী কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে গৃহে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু এ সময় গ্রামবাসীর মনে সহসা নতুন সন্দেহ জেগে ওঠায় তারা আর ফিরে যায় না। ফলে নাট্যকাহিনী পুনরায় ঘটনার আবর্তে জমে ওঠে। গ্রামবাসী মতবরের কথায় আশ্বস্ত হয় বটে, কিন্তু তারা জিজ্ঞেস করে :

এই শুক্কুরে শুক্কুরে সাতদিন হয়া যায়,
গেরামের তল্লাটে তিরসীমায়
একটা মেলেটারির নামগন্ধ নাই।[৪]

গ্রামবাসীর এই সন্দেহের পরিপ্রেক্ষিতে মাতবর তাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য বলে, 'এমনকি গতকাইলও ক্যাপ্টেন সাব ঘুইরা গেছে।' মাতবরের একথা গ্রামবাসী অবিশ্বাস করে। যখন গ্রামবাসী ও মাতবরের কথোপকথনে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচালে নাট্যঘটনা ভারাক্রান্ত তখন মাতবরের মেয়ের উপস্থিতিতে নাট্যঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয় এবং চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। নাট্যঘটনায় মাতবরের মেয়ের নাটকীয় উপস্থিতি, সমগ্র ঘটনায় অভিনব মাত্রা সংযোজন করেছে। মাতবরের মেয়ে মঞ্চে এসে গ্রামবাসীকে জানিয়ে দেয়, তার পিতা তাকেই রক্ষার করতে পারেনি; যে ব্যক্তি নিজের মেয়েকে রক্ষা করতে পারে না, সেই ব্যক্তি গ্রামবাসী রক্ষা করবে– তা ভাবাই যায় না! ফলে গ্রামবাসীর হাতে মাতবর নিহত হয়। কর্মের শাস্তি স্বরূপ মাতবর নিহত হলেও তার রাজনৈতিক জীবনের অসহায়ত্ব দেখে দর্শকের মনে তার প্রতি কিছুটা করুণা ও সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। কেননা তার মেয়ে গ্রামবাসীর সামনে সশরীরে উপস্থিত হয়ে, পিতার বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। মেয়ে সবিস্তারে আড়ালের ঘটনা গ্রামবাসীর সামনে তুলে ধরায়, পিতা মাতবরের অসহায়ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে নারী-জীবনের সমস্ত আবেগ মিশ্রিত সতীত্ব হারানোর বেদনায় রক্তাক্ত মেয়ের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়:

আর সুখ নিজের মেয়ের? কন, কি হইলো তার?
–জিগ্যাসা করেন তারে, এক রাত্রি পরে
সাধের জামাই তার নাই ক্যান ঘরে?
রাত্রি দুইফরে
সে ক্যান ফালায়া গেল আমার জীবন
হঠাৎ খাটাশে খাওয়া হাঁসের মতন?
–করেন জিগ্যাসা।[৫]

মাতবর যে ধর্মের বাঁধনে ও ছলনায় গ্রামবাসীকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছে, সেই ধর্মের নামেই পিতার কৃতকর্মের প্রতি মেয়ে তীব্র ঘৃণা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। এমনকি মেয়ে ধর্ম সম্পর্কে পিতার সম্যক জ্ঞান না থাকার অভিযোগও জনতার সামনে উত্থাপন করেছে। মাতবরের মেয়ে তথাকথিত ধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রূপাত্মক বাক্যবাণ ছুঁড়ে দিয়েছে। এমনকি মাতবরের মেয়ে তার জীবনের সকল ঐশ্বর্য, সম্পদ হারিয়ে ধর্ম এবং আল্লাহর অস্তিত্বেও সন্দেহ পোষণ করেছে। মেয়ের এসব অভিযোগের সামনে প্রতাপশালী পিতা মাতবর নীরব থাকতে বাধ্য হয়েছে। তবে ধর্মের বিরুদ্ধে মেয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলে পির সাহেব তাকে হুশিয়ার করেছে।

মাতবরের মেয়ের হৃদয়বিদারক হাহাকার ধ্বনিতে হাজার বাঙালি নারীর আর্তচিৎকার প্রকাশ পেয়েছে। একাত্তরে নির্যাতিত নারীরা মাতবরের মেয়ের মতো সবাই প্রতিবাদ করতে পারেনি। তাদের অনেকেই পরিণামে হয়তো মাতবরের মেয়ের মতো ধুতুরার বিষ পান করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। স্বাধীনতাযুদ্ধে এ দেশের অসংখ্য নারীর সম্ভ্রম পাকবাহিনীর বর্বর সৈনিক কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়েছে। এদের সকলের কথা হয়তো জানাও সম্ভব হয়নি। কিংবা এরা সকলেই প্রতিবাদ করে ধর্মের দালালদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে যেতে পারেনি। তবে মাতবরের মেয়ে আত্মহত্যা করলেও গ্রামবাসীর মনে একটি আদর্শকে জাগিয়ে দেয়। গ্রামবাসীকে মেয়ে জানাতে সক্ষম হয় যে, ধর্মের নামে বাঙালি জাতির ওপর পাকিস্তানীরা নির্যাতন করছে; সেই নির্যাতনের হাত থেকে পাকিস্তানপন্থী মাতবরের মেয়ে হয়েও সে রক্ষা পায়নি। এরপর কাব্যনাটকের কাহিনী দ্রুত ভিন্নখাতে মোড় নেয়। গ্রামবাসী প্রথম দিকে মাতবরের বিরুদ্ধে চাপা একটা ক্ষোভ দেখিয়েছে; কিন্তু সরাসরি কোনো মন্তব্য করার সাহস দেখায়নি। মাতবরের মেয়ের মৃত্যুর পর, তাদের সে ভয় দূর হয়েছে। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেয়ের লাশ নিয়ে, তার মৃত্যুর জন্য দায়ী মাতবরের বিচার দাবি করেছে। মেয়ের মৃত্যুর পর গ্রামবাসী মাতবরের কোন অনুরোধ শুনতে চায়নি। বরং গ্রামবাসী বলেছে:

> আছে দরকার। আছে জরুরি কারণ।
> যতটা না তুমি মন্দ বইলা দিবা তোমার জীবন
> তারো চেয়ে, তোমারে যে মন্দ হইতে দিছি সর্বজন
> তারই জন্যে চাই আইজ তোমার মরণ।
> যদি না তোমার রক্ত গেরামের সড়ক ভিজাবে
> তবে আবার কিভাবে
> মানুষ সড়ক দিয়া মাথা তুইলা যাবে?[৬]

গ্রামবাসীর এই বক্তব্য থেকে মাতবর নিশ্চিত বুঝতে পারে, সে সাধারণ জনতার নিকট ক্ষমা পাবে না। কিংবা তার এই অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।[৭] তাই সে গ্রামবাসীর নিকট শেষ অনুরোধ করে, তার মৃত্যুর পর যেন গ্রামেই তাকে কবরস্থ করা হয়। কিন্তু গ্রামবাসী তার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তাদের মতে, শত্রুর শেষ রাখতে নেই। বিশ্বাসঘাতক মাতবরের চিহ্ন পর্যন্ত গ্রামবাসী রাখতে চায়নি সতেরো গ্রামে। কিন্তু এ সময় কাব্যনাটকের রহস্যময় চরিত্র পীর সাহেব বলেন :

> উঠাইয়া নিলেই কি সব কি উঠান যায়
> দাগ, একটা দাগ রাইখা যায়

মাটিতে সে দাগ সহজে কি যায়?[৮]

পিরসাহেবের এই উক্তি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মন্তব্য, সন্দেহ নেই। সেই 'দাগ' মুছতে না পারার কারণে আজও এ দেশে পাকিস্তানী দোসরদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত রয়েছে। মাতবরের অনুরোধ রক্ষায় গ্রামবাসী অপারগতা প্রকাশের পরপরই নাট্যমঞ্চ মুক্তিবাহিনীর দখলে চলে যায়। সমগ্র কাব্যনাটকে মুক্তিবাহিনীকে একবারই মঞ্চে দেখা যায়। এ সময় মাতবরের দেহরক্ষী পাইকের হাতে মাতবরের মৃত্যু ঘটে। সৈয়দ শামসুল হক এ কাব্যনাটকে বাংলাদেশের সর্বাধিক গৌরবান্বিত ঐতিহাসিক ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এ দেশের সমাজ, সংস্কৃতি সর্বোপরি গণমানুষের জীবনবোধ উপস্থাপন করেছেন। 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাটকের অনুপম কাহিনীর অবিচ্ছেদ্যতার পাশাপাশি নাট্যকারের অসামান্য কাব্যপ্রতিভার চমৎকার সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

দুই. জননেতা নিহত হওয়ার পর

সমাজ সংস্কৃতি, ইতিহাস ঐতিহ্য ও রাজনীতি সচেতন সৈয়দ শামসুল হকের *গণনায়ক* (১৯৭৬) কাব্যনাটকটি বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রচিত। পঁচাত্তর সালে এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ড *গণনায়ক* কাব্যনাটকের মূল আখ্যানভাগ। *গণনায়ক* রচনার পূর্বে সৈয়দ শামসুল হক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* কাব্যনাটকে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়ে কাব্যনাটক রচনার নিরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। এ কারণে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে কাব্যনাটক রচনায় তাঁকে সমস্যায় পড়তে হয়নি। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'-এর সাফল্য তাঁকে *গণনায়ক*- এর ঘটনা কাব্যনাট্যাঙ্গিকে প্রকাশের ক্ষেত্রে সাহস জুগিয়েছে। সৈয়দ হক রাজনীতির মূলমন্ত্র হিসেবে দেশপ্রেম, জনগণ, অস্ত্র, বিবেক ইত্যাদি বিষয়ের মৌলসূত্র অনুসন্ধান করতে গিয়ে শেক্সপিয়রের *জুলিয়াস সিজার* নাট্যকাহিনী আবিষ্কার করেন। *গণনায়ক* কাব্যনাটক রচনাকাল সম্পর্কে লেখকের স্ববিরোধী তথ্যের কারণে এর বিষয় হিসেবে 'মুজিব-হত্যা'র প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সংশয় জাগিয়ে তোলে।[৯] তাছাড়া 'গণনায়ক' কাব্যনাটকের কাহিনীর সঙ্গে শেক্সপিয়রের *জুলিয়াস সিজার*- এর নাট্যঘটনার সাদৃশ্য অনস্বীকার্য। তবে 'গণনায়ক'-এর কাহিনী 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের সরাসরি অনুবাদ নয়। সৈয়দ হকের স্বীকারোক্তি এরকম :

> অনুসন্ধিৎসু পাঠক লক্ষ্য করবেন, অনুবাদ আমি করিনি, রূপান্তরিত রচনাও একে বলা যাবে না; আমি বরং বহু পূর্বে গত এক অগ্রজের সঙ্গে বসে সচেতনভাবে নতুন একটি রচনায় হাত দিয়েছি। শেক্সপিয়র রচিত কিছু চরিত্র, কিছু দৃশ্য বর্জন করেছি; আবার নতুন কিছু অংশ রচনা করছি কিছু চরিত্রের নতুন লক্ষণ ও পরিণতি দিয়েছি; এবং এ সবই করেছি আমার অভিজ্ঞতা এবং সিদ্ধান্তগুলো স্থাপিত করবার জন্যে।[১০]

গণনায়ক কাব্যনাটকে বাংলাদেশের রাজনীতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যক্ত হয়েছে, এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। 'জুলিয়াস সিজার'-এর কাহিনীর ওপর ভিত্তি করেই হয়তো সৈয়দ শামসুল হক 'গণনায়ক' কাব্যনাটকের মৌলকাঠামোটি এ দেশীয় নাট্যদর্শকের উপযোগী

করে রচনা করেছেন। *জুলিয়াস সিজার*- এর প্রভাব সম্বন্ধে নাট্যকারের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও একথা সত্য যে, *গণনায়ক* কাব্যনাটকের কাহিনীতে যেটুকু পরিবর্তন করেছেন তার ওপর ভিত্তি করে রচনাটিকে অনুবাদমূলক না বলে মৌলিক রচনা হিসেবে গ্রহণ করাই শ্রেয়। *গণনায়ক*-এর মূলকাহিনী শেক্সপিয়রের রচনা থেকে গ্রহণ করা হলেও এর পটভূমি ও আঙ্গিকগত বিন্যাসে যে পরিবর্তন সৈয়দ হক করেছেন, তার ভিত্তিতে রচনাটি মৌলিক হিসেবে গণ্য হয়। উপরন্তু দেশীয় অনুষঙ্গ এতে প্রযুক্ত হওয়ায় নাট্যকাহিনীর সম্পূর্ণ পরিবেশ পরিস্থিতি বদলে গেছে এবং বাঙালি দর্শকের মনে *গণনায়ক* মৌলিক সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সৈয়দ শামসুল হক *জুলিয়াস সিজার* অবলম্বনে *গণনায়ক* কাব্যনাটক রচনায় প্রয়াসী হলেও শেষপর্যন্ত এ কাব্যনাটকে 'মুজিব-হত্যা' মূল উপজীব্য হিসেবে প্রতীয়মান হয়।[১১] এ কাব্যনাটকের অবলম্বন *জুলিয়াস সিজার গণনায়ক* কাব্যনাটকে এ দেশীয় দর্শকের মানসিকতার সঙ্গে পরিপূরক বা সঙ্গতিপূর্ণ পটভূমি ব্যবহার করেছেন।

গণনায়ক ওসমানের বিরুদ্ধে তার মন্ত্রী পরিষদের ষড়যন্ত্রকারী সদস্যদের মধ্যে রয়েছে দুজন। একজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সানাউল্লাহ অন্যজন প্রধানমন্ত্রী হুমায়ুন। তারাও রাষ্ট্রপতির জনপ্রিয়তাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি; বলা যায়, সহ্য করতে পারেনি। ঈর্ষাকাতর এই মানুষগুলোর মধ্যে সর্বাধিক ধূর্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী সানাউল্লাহ। সে জানে, কীভাবে কার্যোদ্ধার করতে হয়। কার্যত রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার নীলনকশা সেই প্রণয়ন করে। সানাউল্লাহ জানে, রাষ্ট্রপতির পরেই প্রধানমন্ত্রী হুমায়ুনের জনপ্রিয়তা। রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করতে হলে, অবশ্যই হুমায়ুনকে ব্যবহার করতে হবে। সানাউল্লাহ মূলত কাব্যনাটকে হুমায়ুনের দ্বিতীয় সত্তা হিসেবে ক্রিয়াশীল। এই দ্বিতীয় সত্তার মাধ্যমে সৈয়দ শামসুল হক মুখোশধারী হুমায়ুনের অন্তর্সত্য উন্মোচন করেছেন। সানাউল্লাহর পরামর্শেই হুমায়ুন তার স্বীয় সত্তাকে আবিষ্কার করে জেনেছে সে একজন ক্ষমতালিপ্সু মানুষ। ওসমানের মতো ভীরু ও দুর্বল লোকের পক্ষে দেশ শাসন করার কোন অধিকার এবং যোগ্যতা নেই বলে মনে করে সানাউল্লাহ। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেষপর্যন্ত হুমায়ুনকে ক্ষমতালিপ্সু করে তুলতে সক্ষম হয়। হুমায়ুনের মনেও আশংকা ছিল, জনগণ যদি ওসমানকে 'আজীবন রাষ্ট্রপতি' হিসেবে পাওয়ার দাবি তোলে সেক্ষেত্রে তার রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগের বাসনা কোনোদিন পূর্ণ হবে না। গণনায়কের সুযোগ্য রাজনৈতিক সহকারী রশীদ আলি জনগণের পক্ষ থেকে তাঁকে 'আজীবন রাষ্ট্রপতি' হিসেবে ঘোষণা করলে হুমায়ুনের আশংকা তীব্রতর হয়। ওসমান তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছে সত্য, কিন্তু হুমায়ুনের সন্দেহ রশীদ আলি ঠিকই এই প্রস্তাব সংসদ অধিবেশনে উত্থাপন করে তা পাস করিয়ে নেবে। এ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে রাষ্ট্রপতিকে হত্যার ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করে।[১২] বিশেষত সানাউল্লাহ রাষ্ট্রপতি হিসেবে ওসমানের দুর্বলতা, অযোগ্যতা, ভীরুতা এবং শাসনকার্য পরিচালনার অদক্ষতা সম্বন্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে মতৈক্য তৈরিতে সক্ষম হয়। বিশেষত প্রধানমন্ত্রী হুমায়ুনের মনে সৃষ্টি করে ক্ষমতালিপ্সা :

> বলুন তবে, প্রধানমন্ত্রী, কেন সেই কালাপাহাড়
> হেঁটে যাবে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পা ফেলে,
> আর আমরা তাঁর পায়ের তলায় পিষ্ট হবো ক্ষুদ্র বলে?[১৩]

অতএব এটা সহ্য করা যায় না, ফলে ষড়যন্ত্রীরা সংসদ অধিবেশনের পূর্বেই রাষ্ট্রনায়ক ওসমানকে হত্যার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে। কাব্যনাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতে দেখা যায়, ক্ষমতালোভী হুমায়ুনের বাসভবনে চক্রান্তকারীরা একত্রিত হয়েছে। তথ্যমন্ত্রী মীর্জা, ফরিদপুরের আবু তাহের, রংপুরের দাউদ চৌধুরী, চট্টগ্রামের ফজলুল হক প্রমুখ সংসদ সদস্য সানাউল্লাহ-হুমায়ুন গংদের ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়। উল্লেখ্য, এদের সাথে ব্রিগেডিয়ার খান এবং সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর প্রধানও একাত্মতা প্রকাশ করে। অর্থাৎ দেশ রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের কেউ কেউ রাষ্ট্রনায়কের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। চক্রান্তকারীদের সম্মিলিত সভায় সিদ্ধান্ত হয়– শুধু ওসমানকে হত্যা করাই যথেষ্ট। কেননা 'বড় নদী মরে গেলে শাখা নদী এমনিতেই বুঁজে যায়।' গণনায়ককে হত্যার পরিকল্পনা সভায় হুমায়ুন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদের মতো ব্যাখ্যা করে :

> বন্ধুগণ, আসুন আমরা তাঁকে হত্যা করি প্রেমের উদ্বোধনে,
> ঘৃণার দহনে নয়। হত্যা করি ব্যক্তিগত সিদ্ধির জন্য নয়,
> জাতির সমৃদ্ধির জন্য। নইলে বাংলার মানুষ বলবে
> আমরা ঘাতক, মুক্তিদাতা নই।[১৪]

এ ভাষণের মাধ্যমে হুমায়ুন নিজেকে জনগণের সামনে নায়ক হিসেবে উপস্থাপনের কূটকৌশল বিজ্ঞ কূটনীতিকের ন্যায় করেছে। এমনকি হুমায়ুন ষড়যন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়ার কথাও বলেছে। হুমায়ুন এবং তার সহযোগীরা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েও তাদের সিদ্ধান্তকে ন্যায় হিসেবে জনগণের সামনে প্রতিষ্ঠিত করার কূটনৈতিক প্রয়াসও গ্রহণ করেছে। কাব্যনাটকের তৃতীয় অংকে জননেতা ওসমান হত্যার দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে। গণনায়ক ওসমানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাট্যঘটনার সমাপ্তি হওয়ার কথা থাকলেও তা ঘটেনি। বরং ওসমানের মৃত্যুর পরেই কাব্যনাটকের কাহিনী আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে এবং ষড়যন্ত্রকারীদের পরিণাম দৃশ্য পর্যন্ত নাট্য-ঘটনায় টানটান উত্তেজনা বিদ্যমান থেকেছে। গণনায়কের মৃত্যুর আগে নাট্যকার একদিকে ওসমানের জনপ্রিয়তা অন্যদিকে তার পারিষদবর্গের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। ক্ষমতাসীন ওসমান দেশদ্রোহীদের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। কিন্তু গণনায়ক শেষরক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। ওসমান জীবিতকালে দেশদ্রোহী ফজলুল হকের উদ্দেশ্য যে সংলাপ উচ্চারণ করেন, তা থেকে অনুমান করা যায় গণনায়ক ওসমান তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিষয়টি পূর্বেই সম্ভবত কিছুটা অনুমান করেছিলেন।

গণনায়কের সহকারী রশীদ আলি মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে এবং আত্মহত্যা করার ঘোষণা দেয়। সানাউল্লাহ তাকে সন্দেহ করলেও হুমায়ুনের অনুমতি নিয়ে সংসদে ভাষণ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। হন্তারক দল তাকে আশ্বাস দেয়, গণনায়কের মৃতদেহ জাতীয় সংসদের পতাকা দিয়ে ঢেকে তাঁকে রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শনের। জাতীয় সংসদে হুমায়ুনের ভাষণ দেওয়ার পূর্বে রশীদ আলির সহযোগী জেনারেল চৌধুরী নাট্যঘটনায় প্রবেশ করে। জেনারেল চৌধুরী গণনায়কের পক্ষের শক্তি বিধায়, রশীদ তাকে সংসদে আসতে বারণ করে। রশীদের এই আচরণে স্পষ্ট বোঝা যায়, সে কখনো হুমায়ুনকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্বীকৃতি দেবে না বা মেনে নেবে না। সে শুধুমাত্র প্রতিরোধের উপায় খুঁজেছে।

ইতোমধ্যে হুমায়ুন সংসদে বাক্‌চাতুর্যপূর্ণ ভাষণে জনগণের ক্রোধ প্রশমিত করতে সক্ষম হয়। ভাষণের চাতুর্যে হুমায়ুন জনমনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। উপরন্তু তার দলের লোক সংসদে অধিক হওয়ায় সাংসদদের সমর্থন লাভও তার জন্য সহজ হয়। হুমায়ুনের ভাষণে মানুষের প্রিয় নেতা *গণনায়ক* চিহ্নিত হয় রাষ্ট্রদ্রোহী তথা খলনায়ক হিসেবে। অতএব রাষ্ট্রদ্রোহীর শাস্তি হয়েছে, এখন প্রয়োজন নতুন বাংলাদেশ গড়ার কাজে মনোনিবেশ করা। দেশ গড়ার দায়িত্ব নিয়মানুসারে প্রধানমন্ত্রী হুমায়ুনের ওপর বর্তায়। হুমায়ুনের চাতুর্যপূর্ণ বক্তব্যে জনগণও বিভ্রান্ত হয়ে গণনায়ককে দেশদ্রোহী ভাবতে শুরু করেছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতি আমূল বদলে যায়, যখন রশীদ আলি সংসদে ভাষণ দেয়। গণনায়কের প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক সহকারী রশীদ আলির ভাষণের পর কাহিনীর পটপরিবর্তিত হয় নাটকীয়ভাবে। রশীদ আলি জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে বলে :

> আর আজ তাঁর মৃতদেহের সমুখে দাঁড়িয়ে, এমন কি কারণ
> যার জন্যে আপনাদের মতো আমিও শোক প্রকাশে বিরত?
> হায়, মানুষের বিবেক, তুমি পলাতক; যুক্তি পথভ্রষ্ট।[১৫]

গণনায়কের সহকারীর এই ভাষণে কাব্যনাটকে চরম নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কেননা তখন অনেক সাংসদই অনুভব করেছে, গণনায়কের কীর্তি ও সংগ্রামের ইতিহাস কী ছিল! এ ভাষণের পর অনেকেই প্রভাবিত হয় এবং গণনায়কের লাশ জনগণকে দেখানোর দাবি জানায়। সাধারণ জনগণ এবং নিরপেক্ষ সাংসদগণ গণনায়কের লাশ দেখার পর বুঝতে পারে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এতে দেশপ্রেমিকদের মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে। এখানে কাব্যনাটকের নাট্যিক সংকট মোচনের গ্রন্থি ক্রিয়াশীল হওয়ায়, দ্রুত অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে। গণনায়কের পক্ষে জনগণ আরো স্লোগান তোলে 'বিচার চাই, বিচার চাই, তোমার খুনের বিচার চাই।' নাট্যিক উত্তেজনাময় এই পরিস্থিতির সুযোগে ষড়যন্ত্রকারীরা সংসদ ভবন থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তাৎক্ষণিকভাবেই প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানগণ রশীদ আলির পক্ষে অবস্থান নিয়ে চক্রান্তকারীরা যাতে পালিয়ে রাজধানী ছাড়তে না পারে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

গণনায়ক কাব্যনাটকের ওসমান চরিত্রের উত্থান ও পরিণতির সাথে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলির রয়েছে। ওসমান হত্যাকাণ্ডের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার ঘটনা সমান্তরাল তবে নাট্যকার *গণনায়ক* কাব্যনাটকে সিজার হত্যাকাণ্ডের নবতর রূপায়ণ ঘটিয়েছেন।[১৬] প্রাসঙ্গিকভাবে 'গণনায়ক' কাব্যনাটকের ওসমান চরিত্রটিকে শেখ মুজিবুর রহমানের সমান্তরাল বিবেচনা করলেও খুব একটা ভুল হয় না।[১৭] এজন্য কাব্যনাটকের অনেক সংলাপে মুজিব-হত্যাকাণ্ডের আভাস পাওয়া যায়। এ কাব্যনাটকের চরিত্রগুলো প্রধান দুটো ধারায় বিভক্ত। একটি গণনায়কের পক্ষের শক্তি, অন্যপক্ষ গণনায়কের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কাব্যনাটকে তৃতীয় একটি পক্ষ হচ্ছে সামরিক বাহিনী। এরা প্রথমে গণনায়কের পক্ষেই ছিল, কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারা নিজেরাই একটি স্বতন্ত্র পক্ষ হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তারাই রাষ্ট্রক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। এই তৃতীয় দলের প্রধান, জেনারেল চৌধুরী। *গণনায়ক* কাব্যনাটকের কাহিনী এই তিনটি পক্ষের নানান সংঘাত ও

দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে বিকশিত হয়েছে। সাধারণ নাটকে নাটকীয় পরিস্থিতির স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য এভাবে চরিত্রের মধ্যে নাট্যকার বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটিয়ে থাকেন। কাব্যনাটকে এ ধরনের নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে নাট্যকারকে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয়।[১৮] সৈয়দ শামসুল হক দক্ষ নাট্যকারের মতোই *গণনায়ক* কাব্যনাটকে এ ধরনের নাটকীয় পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। রাষ্ট্রপতি ওসমানের বিপরীত পক্ষের চরিত্রগুলোও নাট্যকার অসাধারণ দক্ষতায় নির্মাণ করেছেন।

গণনায়কের জীবিতাবস্থায় জেনারেল চৌধুরী তাঁর পক্ষের লোক ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এবং পরবর্তী পর্যায় রাজনৈতিক ঘটনার দ্রুত পালাবদলে জেনারেল চৌধুরীর অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্নতর হয়ে উঠেছে। জেনারেল তখন কোন দলেরই নয়, নিজেই একটি দল হয়ে উঠেছে। কেননা তার হাতে রয়েছে, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। সে অন্যান্য বাহিনীর সাথে আঁতাত করে কৌশলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। জেনারেলের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত হওয়ার পরের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে দেখা যায়— ষড়যন্ত্রের মূল হোতারা পালিয়ে জীবন রক্ষার চেষ্টায় রত। প্রাজ্ঞরাজনীতিক রশীদ আলি তার হুকুমের বাইরে চলতে পারে না, অথবা সে এই সামরিক সরকারের নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হয়। কাব্যনাটকের এই পরিণতিতে মূলত তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন সৈয়দ হক। তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে সামরিকজান্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ জেনারেল চৌধুরী। কাব্যনাটকে সাধারণত যন্ত্রণাবিদ্ধ আধুনিক মানুষের বেদনাবোধ, সূক্ষ্ম মানসিকতার উপস্থাপন প্রক্রিয়া চলে। সৈয়দ শামসুল হক সচেতনভাবে *গণনায়ক* কাব্যনাটকে রাজনৈতিক ক্ষমতালিপ্সার মর্মভেদী বিকারগ্রস্ত মানসিকতার উন্মোচন করেছেন।

তিন. আধুনিক ব্যক্তিমানুষের স্বার্থপরতা

সৈয়দ শামসুল হকের *এখানে এখন* (১৯৮১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে মানুষের জীবনযাপনের বিভিন্ন বিপর্যস্ত দিক নিয়ে রচিত। মানুষ কীভাবে স্বার্থসিদ্ধির জন্য সগোত্রের সর্বনাশ করে, মানবীয় গুণাবলি ভুলে যায় *এখানে এখন* কাব্যনাটকে সৈয়দ হক তা তুলে ধরেছেন। এ কাব্যনাটকের বিষয়বস্তু আধুনিক জীবনের জটিলতা যন্ত্রণা ও ব্যক্তি মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ। *এখানে এখন*-এর বিষয় পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় কাব্যনাটক 'আনবিক যুগের শিল্পমাধ্যম হলো কাব্যনাটক।'[১৯] এ কাব্যনাটকে চরিত্রের অন্তর্ঘাত আত্মদ্বন্দ্ব মানসিক সংকট সমকালীন সমাজবাস্তবতায় উপস্থাপিত। এ কাব্যনাটকে ব্যক্তি মানুষের অন্তর্জগতের রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের জনগণকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করে নাট্যকার তাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের গভীরে দৃষ্টিপাত করেছেন। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বাস্তবতায় বাংলাদেশের মানুষ 'ব্যবহর্তা' এবং 'ব্যবহৃত' এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত।[২০] কাব্যনাটকে 'ব্যবহার' শব্দটির প্রয়োগ অভিনব। *এখানে এখন* কাব্যনাটকের অভ্যন্তরীণ জটিলতা ভেদ করতে 'ব্যবহার' শব্দটির ভূমিকা চরিত্রের ন্যায়। এ কাব্যনাটকে 'ব্যবহর্তা' এবং 'ব্যবহৃত' শ্রেণির দ্বন্দ্ব সংঘাত কবি জীবনানন্দ দাশ কর্তৃক প্রয়োগকৃত 'ব্যবহৃত'

শব্দটির চেয়েও অধিকতর ব্যঞ্জনাময়। কবি জীবনানন্দ দাশ 'ব্যবহৃত' শব্দটির প্রয়োগ করেছিলেন এভাবে:

অবাক হয়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি?
রূপ কেন নির্জন দেবদারু দ্বীপের ছায়া চেনে না—
পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে— ব্যবহৃত-ব্যবহৃত—
ব্যবহৃত—
ব্যবহৃত হ'য়ে
ব্যবহৃত— ব্যবহৃত—
আগুন বাতাস জল ঃ আদিম দেবতারা হো-হো ক'রে হেসে উঠলো ঃ
'ব্যবহৃত— ব্যবহৃত হ'য়ে শুয়োরের মাংস হয়ে যায়?' ['আদিম দেবতারা', মহাপৃথিবী]

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় 'ব্যবহৃত' শব্দের তাৎপর্যের সাথে 'এখানে এখন' কাব্যনাটকের 'ব্যবহার' শব্দের তাত্ত্বিক সাযুজ্য থাকলেও কাব্যনাটকে সৈয়দ শামসুল হক 'ব্যবহার' শব্দে অভিনব মাত্রা আরোপ করেছেন। জীবনানন্দ দাশের 'ব্যবহৃত' শব্দটির 'ব্যবহার শুধু বহুদিনের নয়, বহু স্থূল হাতের। কবিতাটি নিঃসন্দেহে এই শতাব্দির অভিশাপ বহন করছে। সভ্যতার সংকটে চিরকালের মূল্যবোধগুলি একে একে ধ্বসে পড়ছে ...।'[২১] কালের অনুরূপ অভিশাপে এ কাব্যনাটকের বিভিন্ন চরিত্রের মানবিকতা এবং নৈতিক মূল্যবোধগুলোর অধঃপতনের পূর্বাপর বিশ্লেষণ করা নাট্যকারের মূল লক্ষ্য। নাট্যকার শাদা বেশধারী চরিত্রের সংলাপে বাংলাদেশের সমকালীন অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে :

সূচনাতে আমাদের প্রস্তাব ছিল যে,
পারলে খোলশ ছিঁড়ে কাহিনীর অত্যন্ত গভীরে
প্রবেশ করব।
এবং নির্ণয় করে নিতে চাইব যে,
এ কাহিনী আতংকের অথবা প্রেমের?
স্বাস্থ্যের? অসুস্থতার?
অথবা এ কাহিনীটি আমাদের অনেকেরই কিনা?[২২]

সমাজ জীবনের পটভূমিতে ব্যক্তি স্বার্থমগ্ন অসংখ্য মানুষের ভেতর থেকে কতিপয় মানুষের জীবনকাহিনী নিয়ে 'এখানে এখন' কাব্যনাটকের আখ্যানভাগ রচিত। মানবজীবনে নিত্যকার দ্বন্দ্ব সংঘাত জ্বালা যন্ত্রণা এবং ব্যক্তির অন্তর্গত উপলব্ধির নানা বিষয় কাব্যনাটকের মূল চালিকাশক্তি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাব্যনাটকের বিষয়বস্তু সামাজিক বিষয় থেকে সংগ্রহ করা খানিকটা বিপজ্জনক। কেননা সামাজিক বিষয়ের বিশাল বিস্তৃত পটভূমির মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে; এতে কাব্যনাটকের কবিত্বগুণ ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা অধিক।

কাব্যনাটকের সুলতানা সহজ সরল ও সাধারণ মন মানসিকতা সম্পন্ন আপাদমস্তক এক বাঙালি নারী। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে রফিকের সঙ্গে তার প্রণয় ছিল; কিন্তু তার বিয়ে হয়, গাফফারের সাথে। এ ব্যাপারেও সুলতানার তেমন কোন অনুতাপ ও অনুযোগ নেই। অথচ বিয়ে পরবর্তী কালে গাফফার তাকে অবহেলা করেছে। বিশেষত তার পুরুষত্বহীনতা সংসারের প্রতি সুলতানাকে বিরাগী করে তোলে। সুলতানা দীর্ঘদিন গাফফারের সংসার

করেও সন্তানের মা হতে পারেনি। তথাপিও সুলতানা শুধুমাত্র জৈবিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। সন্তানহীনতার স্বাভাবিক কষ্ট বুকে নিয়েই সুলতানার সংসারজীবন অতিবাহিত হচ্ছিল, কিন্তু রফিক তাকে পুনরায় প্রেমের আবেগে বিচলিত করে তোলে। সন্তানহীনা স্বামী-সুখ বঞ্চিতা সুলতানার পক্ষে রফিকের মতো প্রেমিকের আহ্বানের সাড়া না- দেওয়ার কোন কারণ ছিল না। ফলে সুলতানা নতুন করে রফিকের সঙ্গে ঘর বাধার স্বপ্ন দেখে।

সুলতানা জানে, রফিকের মন বলে কিছু নেই। এমনকি তার চরম অর্থলিপ্সু মানসিকতা সম্বন্ধেও সুলতানা অবহিত। রফিকের সঙ্গে সুলতানার সম্পর্ক নির্মাণের ভিত্তি সম্পূর্ণ মানবিক আবেগ সঞ্জাত। তবে সুলতানার এই জীবনপিপাসা সমাজ সহজভাবে মেনে নেয় না। সম্ভবত এজন্যই সুলতানা অবৈধ শরীরী সম্পর্ক তৈরি না করে রফিককে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। সুলতানা সমাজকে শ্রদ্ধা করে, তাই দীর্ঘদিন রফিকের সাথে শেয়ার করা ফ্লাটে বসবাস করেও তার পুরনো প্রেমিকের ভালোবাসার খোঁজখবর নেয়নি। অথচ সে রফিকের খাট থেকে মিনতির কানের দুল খুঁজে পেয়ে ঈর্ষাবোধ করেছে। কেননা সে ভালোবাসার ভাগ দিতে চায়নি। ভালোবাসার ঈর্ষা থেকেই সুলতানা বিয়ের বন্ধনে রফিককে আবদ্ধ করতে চেয়েছে। অতএব 'ব্যবহৃত' শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী সুলতানার এই খাঁটি ভালোবাসা সমাজের চোখে দৃষ্টিকটূ হলেও সম্পূর্ণ মানবিক। তাছাড়া সুলতানার ধর্মপরায়ণতার বিষয়টিও নাট্যকাহিনীতে স্পষ্ট। ধর্মীয় পবিত্রতা রক্ষার দায় থেকেই সুলতানা নপুংশক স্বামীর সংসার ছেড়ে যেতে পারেনি। তবে সুলতানা মনে করে, তার স্বামী ধর্মের নামে যা করে তা প্রকৃত অর্থে ইসলাম ধর্মের আদর্শ নয়। সে বিশ্বাস করে, ইসলামে জীবনধর্ম বা সংসারধর্মের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গাফফারের ধর্ম পালনের ব্যাপারটি তার নিকট বাড়াবাড়ি বলেই মনে হয় :

> মনে হয় যেমন মানুষ
> ব্যাংক ব্যালান্স বানায়, তেমনি সে আমার স্বামীটি
> আল্লাহর খাতায় তার সোয়াবের সেভিংস খুলেছে।
> হয়তো শুনতে কিছু খারাপ শোনাবে, তবু শোন,
> পাশের মানুষটিকে যে অবহেলো করে,
> ভালোবাসে আল্লাহ সে কি করে?[২৩]

মিনতি কাব্যনাটকে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নিম্নবর্গের অসহায় নারী সমাজের প্রতিনিধি। মিনতির পরিণতি কাব্যনাটকে সুলতানার চেয়েও ভয়াবহ ও মারাত্মক। জীবনের বাস্তবতাকে মিনতি দেখেছে, এসিডে ঝলসান অবস্থায়। *মিনতি* চরম মানবিক সংকটে নিপতিত হয়ে অবচেতনে রফিকের নিকট তার জীবনের করুণ অভিজ্ঞতার কথা বলেছে। পিতার মৃত্যুর পর মিনতির একমাত্র ভাই সস্ত্রীক দুবাই চলে যায়। আর ক্ষুধার জ্বালায় মিনতি গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে মিনতির মতো অনেক নারীই ক্ষুধার যন্ত্রণায় পতিতায় পরিণত হয়েছে। মিনতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার মানবতার বিপর্যয়কে তুলে ধরেছেন। কাব্যনাটকে মিনতির ব্যবহর্তা রফিক অবশ্য তার সাথে গণিকাসুলভ আচরণ করেনি। এই সুযোগে মিনতির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া মানবিক

বোধগুলো পুনরায় জেগে ওঠে। বোধহয় এজন্যই সে রফিকের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে। মিনতির জীবনেও অনেক স্বপ্ন সত্য হয়েছে, তবে সেসব সুখপ্রদ নয়। রফিকের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রকারান্তরে তার জীবনবোধ ও আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেছে :

> যেমন ধরুন স্বপ্নে আমি ছোটবেলা থেকে প্রায় পূর্ণিমারাতে
> নিজেকেই দেখতে পেতাম ঘননীল কি সুন্দর শাড়ি পরে
> মাঠের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি কতদূর দিগন্তের দিকে,
> হাঁটছি না ভেসে যাচ্ছি সবুজ ঘাসের ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে।[২৪]

রফিকের সঙ্গে দৈহিক মিলনের আবেগঘন মুহূর্তে তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মিনতি বলেছে, সেও নাকি স্বপ্নে রফিককে দেখেছে। সে আগে তাকে নেত্রকোনায় দেখত, এখন ঢাকায় দেখে। স্বপ্ন সম্বন্ধে মিনতির এই ব্যাখ্যা– শুধুমাত্র তার দেহব্যবসার কৌশল ভাবা যায় না। কেননা এ সময় মিনতি দেহমিলনে তৃপ্ত অবস্থায় জীবনের সত্য প্রকাশ করেছে। এভাবে মূলত মিনতি জীবনের উত্তাপ অনুসন্ধান করেছে। পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করলেও মিনতির অভ্যন্তরে সহজ সরল নিরাভরণ এক মানবিক সত্তা সমর্যাদায় উপস্থিত ছিল। এ কাব্যনাটকের মিনতি সর্বাধিক করুণভাবে ব্যবহৃত চরিত্র।

এখানে এখন কাব্যনাটকে সৈয়দ শামসুল হক স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক শ্রেণিবৈষম্য শৈল্পিক সুষমায় উপস্থাপন করেছেন। স্বাধীনতার পূর্বে এ দেশের মানুষ যেমন পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছে, ঠিক একইভাবে স্বাধীনতার পরেও এ দেশের একশ্রেণির মানুষ ব্যবহৃত হয়েছে। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, স্বাধীনতার পরও এবারও শাসকদলের কতিপয় স্বার্থান্বেষী মানুষ ব্যবহর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়; যাদের সঙ্গে পশ্চিমা শোষকগোষ্ঠীর ভাবগত বা আদর্শগত কোন পার্থক্য নেই। মূলত এ কাব্যনাটক সমকালীন সমাজজীবনের প্রামাণ্যচিত্র। আধুনিক মানবজীবনের সমস্যাসংকুল বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ পথের বিভিন্ন বাঁকে বাঁকে যেসব ঘটনা ঘটে *এখানে এখন* কাব্যনাটকে তা উঠে এসেছে।

চার. প্রান্তিক মানুষের সংগ্রাম

সৈয়দ শামসুল হক ইতিহাসের ঘটনা নিয়ে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* কাব্যনাটক রচনার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে *নূরলদীনের সারাজীবন* (১৯৮২) কাব্যনাটক রচনা করেন।[২৫] এ কাব্যনাটকের মূল উপাদান নাট্যকার ইতিহাস থেকে গ্রহণ করেছেন বটে কিন্তু পুরোপুরি ইতিহাসের ঘটনা অনুকরণ করেননি। নাট্যঘটনা ও স্থানের ঐতিহাসিক সত্যতা আছে তবে নাটকের সব চরিত্র ঐতিহাসিক নয়। এ ছাড়া ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোও উপস্থাপন রীতিতে ইতিহাসের ঘটনাও বহুলাংশে নাট্যকারের নিজস্ব সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

সৈয়দ শামসুল হক *নূরলদীনের সারাজীবন* কাব্যনাটকে হান্টার সাহেব বর্ণিত ইতিহাসের ঘটনা অনুসরণ করেছেন। নূরলদীন, দয়াশীল এবং গুডল্যাডকে ঐতিহাসিক চরিত্র। কোম্পানীর ফৌজি অফিসার ম্যাকডোনাল্ডকে ঐতিহাসিক চরিত্র রূপে গণ্য করেননি সৈয়দ হক। কিন্তু হান্টার সাহেবের রিপোর্টে এবং Bangladesh District Gaztteer's

Rangpur-এ ম্যাগডোনাল্ডের নাম পাওয়া যায়।[২৬] সুতরাং বলা যায়, নূরলদীন ছাড়া এ কাব্যনাটকের অন্যান্য চরিত্র নাট্যপ্রয়োজনে নাট্যকার কল্পনায় সৃষ্টি করে নিয়েছেন। আমৃত্যু বিপ্লবী নূরলদীন গরীব কৃষকদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে নীল কুঠিয়াল এবং এ দেশীয় বিশ্বাসঘাতক 'নীল ব্যবসায়ী' দালালদের বিরুদ্ধে বিপ্লব পরিচালনা করেছিল। নূরলদীন শেষপর্যন্ত সংগঠিত ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারেনি কিন্তু তার এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেয়েছে নিরীহ মানুষ। নূরলদীনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ অবিচল আব্বাসের কণ্ঠে তাই শোনা যায়– 'এ সংগ্রাম চলতেই থাকবে।' ইংরেজ শোষকদের বিরুদ্ধে নূরলদীন বিদ্রোহের যে ধ্বজা উড়িয়েছিল, তা পরবর্তী কালে 'ব্রিটিশ বিরোধী' আন্দোলনের বীজমন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে।

অ্যাবসার্ডধর্মিতায় নূরলদীনের বিগত জীবনের স্মৃতি মৃত নূরলদীনকে মঞ্চের সাথে রেখে ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতির মাধ্যমে উপস্থান করা হয়েছে। নূরলদীনের স্মৃতিচারণায় তার বিপ্লবী জীবনের কথকতা উপস্থাপিত হয়েছে। নূরলদীনের শৈশবে জমিদারের খাজনা পরিশোধ করতে গিয়ে তার বাবাকে চাষের বলদ বিক্রি করতে হয়েছিল। ফলে তার বাবা বলদ সেজে কাঁধে জোয়াল নিয়ে কাঠফাঁটা রোদে জমি চষতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। নূরলদীনের শৈশবের এ ঘটনা থেকে সেকালের কৃষকদের আর্থিক অবস্থা দৈন্য ও ইংরেজ শোষণের মাত্রা উপলব্ধি করা যায়। কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা অবলম্বনে *নূরলদীনের সারাজীবন* রচিত হলেও নাট্যকার আন্দোলনের ঘটনাকে সরাসরি কাব্যনাটকে ব্যবহার করা থেকে বিরত থেকেছেন। নাট্যকার কৃষক পক্ষের 'লালকোরাস' এবং ইংরেজ পক্ষের 'নীলকোরাস' শীর্ষক চরিত্র ব্যবহার করে নাট্যঘটনায় উত্তেজক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। এই কোরাস চরিত্রই কাব্যনাটকে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এ কাব্যনাটকের কাহিনি সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুযায়ী 'প্রস্তাবনা'র মাধ্যমে শুরু করেছেন সৈয়দ হক। উল্লেখ্য, প্রস্তাবক নাট্যঘটনায় সংশ্লিষ্ট কোন চরিত্র নয়। *নূরলদীনের সারাজীবন* কাব্যনাটকের এই প্রস্তাবক সমসাময়িক সমাজের সচেতন জনৈক মানবসত্তা। প্রস্তাবক ইতিহাসের ঘটনা সামনে রেখে নূরলদীনের জীবনসংগ্রামের কাহিনী স্মরণ করে এভাবে:

> ১১৮৯ সনে।
> আবার বাংলার বুঝি পড়ে যায় মনে,
> নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়।[২৭]

প্রস্তাবকের এই সহায়ক ভূমিকায় নাট্যদর্শক সহজে কাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। প্রস্তাবক সংক্ষেপে ইতিহাসের ঘটনা এবং নূরলদীনের জীবনের সারসংক্ষেপ বর্ণনা করে দর্শকের জন্য সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে। নাট্যপ্রস্তাবনায় নূরলদীন জীবিত না মৃত সে বিষয়ে নূরলদীনের সহযোগীদের মনে সংশয় সৃষ্টি হলেও নাট্যদর্শক জানে, নূরলদীন মৃত। কিন্তু কাব্যনাটকের অন্যান্য চরিত্র তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানে না। তাই তারা ব্যগ্রব্যাকুল কণ্ঠে দয়ালের কাছে তাদের প্রাণের নেতা নূরলদীনের খবর জানতে চায়। তারা জানতে চায়– নূরলদীন বেঁচে আছে, নাকি মৃত্যুবরণ করেছে। এ সময় কৃষকদের বুক ভেঙে দিয়ে দয়াশীল তাদের জানায়, 'মোগলহাটে কামান ফাটে কাঁইও বাঁচি নাই।' কাব্যনাটকের প্রথম দৃশ্যান্তরে এ্যাবসার্ডধর্মী নাটকের মতো রক্তাক্ত চাদর গায়ে দিয়ে

নূরলদীন মঞ্চে জীবিত হয়ে ওঠে। নূরলদীনের এই বেঁচে ওঠার বিষয়টি ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এ্যাবসার্ড নাটকের মতো কাব্যনাটকে এ ধরনের নাটকীয় ঘটনার অবতারণা বাহুল্য। তারপরও নূরলদীনকে এভাবে মঞ্চে বাঁচিয়ে তোলার ঘটনাকে দুভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে :

এক.

নূরলদীনের শারীরিক মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু তার প্রচারিত বিপ্লবী আদর্শের মৃত্যু ঘটেনি। এজন্য প্রতীকী অর্থে মৃত নূরলদীনের আদর্শ মঞ্চে জীবিত হয়ে উঠেছে। শোষিত বঞ্চিত কৃষকশ্রেণিকে সংগঠিত হয়ে পুনরায় তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

দুই.

নাট্যকার নূরলদীনের মৃত্যুকে প্রতীকী অর্থে গ্রহণ করেছেন। মঞ্চে ফ্লাশব্যাকের মাধ্যমে নূরলদীনের জীবনাদর্শ জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছেন। এজন্য মঞ্চের জীবিত নূরলদীন তার অতীত জীবনের ঘটনা বর্ণনা করেছে। অন্য কোন চরিত্রের মাধ্যমে নূরলদীনের জীবনকথা ফ্লাশব্যাক করা হলে– নাট্যকার নূরলদীনের ব্যক্তি চরিত্রের সম্পূর্ণ প্রবণতা তুলে ধরতে পারতেন না। এ কারণেও নাট্যকার মঞ্চে জীবিত নূরলদীনকে তথা তার আদর্শকে মঞ্চে জীবিত করে তুলেছেন।

কাব্যনাটকে জীবন্ত নুরলদীনের আহ্বানে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে কৃষকেরা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে কৃষকদের এই যুদ্ধের প্রস্তুতি নাট্যঘটনায় টানটান উত্তেজনা সৃষ্টি করে। সম্পূর্ণ কাহিনি জুড়ে যুদ্ধের দামামা বাজলেও শেষদৃশ্যের পূর্বপর্যন্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। নূরলদীন তার জীবনকথা বর্ণনা করতে গিয়ে মূলত দেশীয় দালাল ও শাসকশ্রেণির অত্যাচারের নির্মম কাহিনিই বর্ণনা করেছে কাব্যনাটকে। তবে নূরলদীনের এই বর্ণনায় তার পারিবারিক, ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাও চমৎকার সাযুজ্যে বর্ণিত হয়েছে। নূরলদীনের স্মৃতিচারণায় কাব্যনাটকে উঠে এসেছে, নীলকর এবং তাদের এ দেশীয় দোসর দালাল মহাজনদের অত্যাচারের ঘটনা। নূরলদীন জানিয়েছে, স্বর্বস্ব হারিয়ে তার বাবা নিজে লাঙল টেনে জমি চাষ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। নূরলদীনের মতো এ ধরনের ব্যক্তিগত মর্মদহন অনুভূতি বিভিন্ন চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে। ফলে কাব্যনাটকের দর্শককে অনুভূতির রাজ্যে টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম হন।

আপাদমস্তক বিপ্লবী নূরলদীন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। তাই সে আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার পূর্বে সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছে তাদের দাবি দাওয়ার কথা; একই সাথে ন্যায় বিচার কামনা করেছে শাসকগোষ্ঠীর নিকট থেকে। নূরলদীন যে সত্যিকারের নেতা, তা এই নিয়মতান্ত্রিক সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় প্রতীয়মান হয়। প্রতিবাদের পর যেকোন বিপদ বিপর্যয় তার অনুসারীদের উপর নেমে আসতে পারে, এটা বুঝতে পেরে সে তার দল নিয়ে সচেতন থাকে। নূরলদীন তার কৃষক বাহিনী নিয়ে পূর্ণিমার রাতে মাঠে সতর্কভাবে রাত কাটিয়েছে। স্ত্রী আম্বিয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাশার কথা,

নূরলদীন তার বন্ধু আব্বাসকে বলেছে। আম্বিয়া তাকে নবাব নূরলদীন হিসেবে দেখতে চায়। অথচ নূরলদীন এই 'কিষাণের বাহিনী' গড়ে তুলেছে, ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়া কিংবা নবাব হওয়ার জন্য নয়। তার আকাঙ্ক্ষা গরিব কৃষকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষের কাজের স্বাধীনতা থাকবে। তার জীবন বাজি রেখে ফতেপুর, কাকিনায়, টেপায়, পাংশায় যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের এই স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। শৈশব কৈশোর যৌবনের এসব স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে এক সময় আব্বাস ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু নূরলদীনের চোখে ঘুম আসে না। নূরলদীনের স্মৃতি রোমন্থন প্রক্রিয়ায় তার অন্তর্চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন নাট্যকার। পূর্ণিমার রাতে সবাই পরম প্রশান্তিতে ঘুমালেও কৃষকদের জীবনমানের উন্নয়নের চিন্তায় নূরলদীনের চোখে ঘুম আসে না। সে ভাবে:

সবে নিঁন যায়।
নিশীথে নামিয়া আসি নিঁন সব নিমেষে ভুলায়।
... ...
হামার না আসে নিঁন চোখের পাতায়।
হামার জগতে শব্দ শান্তি না পায়।
যখন স্তব্ধতা ধরি সবে নিঁন যায়।
হামার জগত ভাঙ্গি ডাকি ওঠে বলদ হাম্বায়।[২৮]

এই ভয়াবহ স্মৃতির যন্ত্রণা নূরলদীন একা একা বহন করতে অক্ষম; তাই সে তার বন্ধুদেরকে জাগিয়ে রাখতে চায়, শোনাতে চায় তার দুঃখের কথা। কিন্তু বন্ধুদের কেউ জাগে না কিংবা জেগে থাকতে পারে না। তার স্ত্রী আম্বিয়া নীরবে এসে তার সঙ্গী হয়, স্বামীর চিন্তায় তারও ঘুম আসে না। আবেগ তাড়িত নূরলদীন এ সময় স্ত্রীকে বলে– 'জাগিবি নিশি সঙ্গেতে আমার।' এরপর স্ত্রী আম্বিয়াকে সঙ্গে নিয়ে সে ঘরে যায়। বিপ্লবী নূরলদীনকে নাট্যকাহিনীতে দুএকবার রোমান্টিক প্রেমিকের মতো মনে হয়। তবে সেখানেও স্বদেশের ভয়াবহ বাস্তবতায় নূরলদীনের রোমান্টিকতা একাকার হয়ে গেছে।

কবিতার সত্যকে নাট্যাঙ্গিকে দর্শকচিত্তে অনুভববেদ্য করে তোলা কাব্যনাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য। ফলে কাব্যনাটকে সাধারণ নাটকের মতো চরিত্রের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ নাও থাকতে পারে। কাব্যনাটক ব্যক্তির বিচিত্র চিন্তাচেতনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ করতে চায়। এক্ষেত্রে প্রাত্যহিক বা দৈনন্দিন জীবনের বিষয়াদিও কাব্যনাটকে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, তবে অনুভূতির এসব জটিল বিষয়াদি সবসময় কাহিনীতে স্পষ্ট নাও হতে পারে। কেননা এখানে কবিতা ব্যক্তিসত্তার অব্যক্ত অনুভূতিগুলোকে জড়িয়ে রাখে।[২৯] ফলে কাব্যনাটকে নাট্যচরিত্রের ক্রমপরিণতি নাও ঘটতে পারে। কিন্তু নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক *নূরলদীনের সারাজীবন* কাব্যনাটকের নায়ক নূরলদীন চরিত্রের সংগ্রামময় সামাজিক জীবনের ধারাবাহিক ক্রমপরিণতি দান করেছেন সফলভাবে। নূরলদীন কৃষকনেতা, সাহসী এবং সংগ্রামী। তার নেতৃত্বে শোষিত কৃষক শ্রেণির মানুষ একত্র হয়। সে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে সুসংগঠিত ইংরেজ বাহিনী এবং এ দেশের দালাল সমাজপতিদের বিরুদ্ধে। নূরলদীন এ কাব্যনাটকের ত্রয়োদশ দৃশ্যে দেশের আপামর জনসাধারণের ব্যক্তিক সামাজিক অর্থনৈতিক

অধিকার প্রতিষ্ঠার যে চিত্র তুলে ধরে, তাতে সে মহান দেশনায়কের আসনে অধিষ্ঠিত হয়। নূরলদীন বলে :

দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
সবার অন্তরে মোর অন্তরের অগ্নি জ্বলিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
সবার অগ্নিতে সব সিংহাসনে অগ্নি ধরিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
মানুষ মানুষ বলি মানুষের কাছে আসিতেছে।[৩০]

নূরলদীনের বন্ধু আব্বাস এ কাব্যনাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র। সে আগাগোড়া সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনার মানুষ। নাট্যকাহিনীর শুরু থেকেই তার মধ্যে সর্বদা একটা পিছুটান লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিকভাবে সে নূরলদীনের বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মে অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদান করেনি, তথাপি আব্বাস তার সাথেই থেকেছে। নূরলদীনের আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হলেও সর্বদা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে তার পাশাপাশি থেকেছে আব্বাস। তবে নূরলদীন যুদ্ধে নিহত হওয়ার পর, আব্বাস দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে নূরলদীনের আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আব্বাসই কাব্যনাটকে একমাত্র চরিত্র, যে সাংসারিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সবসময় নিজের অবস্থান সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছে।

ঐতিহাসিক চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও নায়ক নূরলদীনের অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ আধুনিক মানুষের অন্তর্গত জটিলতার সমান্তরাল। নূরলদীন নবাব হতে চায় কিনা বন্ধু আব্বাসের মুখে একথা বারবার শুনে এক সময় নূরলদীনের মনেও দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সচেতনভাবে নূরলদীন নবাব হতে চাওয়ার বিষয়টি যাচাই করে অস্বীকার করেছে। সে যুক্তির নিরিখে নিজের ক্ষমতা লাভের অবচেতন সুপ্ত বাসনাকে অস্বীকার করে এক ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা করেছে। নূরলদীনের এই মানস সংকট, আত্মতদন্ত আধুনিক ব্যক্তি মানুষের নিত্য অনুষঙ্গ। ব্যক্তি মানুষের আত্মিক চৈন্তিক জটিলতা চিত্রায়নই কাব্যনাটকের প্রধান দায়। সৈয়দ শামসুল হক বিশাল সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 'নূরলদীনের সারাজীবন' কাব্যনাটকে মূলত ব্যক্তি নূরলদীনের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব সংঘাত সংকট চিত্রিত করেছেন। এছাড়া নূরলদীনের মানস বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে নাট্যঘটনায় আব্বাসের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে পুনর্ভাবনার অবকাশ আছে।

পাঁচ. শিল্প-প্রণয় ও যৌনতা

সৈয়দ শামসুল হকের *ঈর্ষা* (১৯৯০) ব্যতিক্রমধর্মী নিরীক্ষামূলক কাব্যনাটক। তাঁর (*ঈর্ষা*) পূর্বে রচিত কাব্যনাটকগুলোর প্রধান বিষয় উপাদান ও নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে– সমাজ রাষ্ট্র ও অর্থনীতি তথা রাজনৈতিক চেতনা। কিন্তু *ঈর্ষা* কাব্যনাটকে তিনি মূল প্রেক্ষণবিন্দু স্থির রেখেছেন ব্যক্তি মানুষের অন্তর্সত্য আবিষ্কারের দিকে। *ঈর্ষা* কাব্যনাটকের তিনটি চরিত্রেই ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ মানসচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছেন সৈয়দ হক। ব্যক্তি মানুষের সাথে ব্যক্তির সমাজের রাষ্ট্রের যে সম্পর্ক এবং তৎসঞ্জাত উপলব্ধির ধারাবাহিক মানসচেতনার রহস্য উন্মোচন করা *ঈর্ষা* কাব্যনাটকের মূল উদ্দেশ্য। এ কাব্যনাটকের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ মনোজাগতিক এবং মানবিক। কাব্যনাটকে ব্যক্তি মানুষের

মানবিক চিন্তাচেতনার সঙ্গে পারস্পরিক সম্বন্ধ, সংঘাত ও মানসিকতার পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ের সূক্ষ্ম চুলচেরা বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনী গতিশীল হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক *ঈর্ষায়* অসাধারণ কাব্যভাষায় মানবিক চেতনা ও প্রবৃত্তির সার্থক নাট্যরূপ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার নিজে বলেন :

> ঈর্ষা হয় এক বিস্ময়কর পরিস্থিতি, ঈর্ষা হয় একই সঙ্গে পাশবিক ও মানবিক একটি অনুভূতির সাধারণ নাম যার মূল ক্ষেত্র প্রেম কিম্বা দেহ-সংসর্গ; হয় বিস্ময়কর, মানবের বেলায়, এ কারণে যে, যে-মানুষ নিজের সীমা ও ভর সম্পর্কে সচেতন থেকে জীবনের অপর সকল প্রসংগে আজীবন ঈর্ষাহীন, প্রেম বা দেহ-সংসর্গের অনুষ্ঠানে সেই মানুষটিই নিজেকে হতে দেয় ঈর্ষাদষ্ট, পূর্বের আত্মচেতনা প্রয়োগ করতে সে হয় বিস্মৃত।[৩১]

এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ঈর্ষা মানবজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। কেননা ঈর্ষায় একই সাথে প্রেম ও ঘৃণার সহাবস্থানের কারণে কখনো কখনো এর ফল অত্যন্ত বেদনাদায়ক অথবা ভয়াবহ হতে পারে। সৈয়দ শামসুল হক কাব্যনাটকে যে ঈর্ষার কথা বলেছেন, তা সম্পূর্ণভাবে মানবিক। এই ঈর্ষা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। মানবিক ঈর্ষার মাত্রা প্রবল ও ভয়ংকর, কিন্তু পাশবিক ঈর্ষার ন্যায় ধ্বংসাত্মক নয়। ওথেলোর ঈর্ষা পাশবিক ছিল, তাই সে ডেসডিমোনাকে হত্যা করেছে। মানবিক ঈর্ষার পরিণতি মৃত্যুর মতো ধ্বংসাত্মক কিংবা অনিবার্য নয়; এর পরিণতিতে মৃত্যুর চেয়েও হয়তো শতগুণ ভয়ানক কষ্ট, যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা থাকতে পারে। মানবিক ঈর্ষার তীব্র দহনে মানসিক যন্ত্রণায় ও আত্মগ্লানিতে ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি, ভালো মন্দ প্রভৃতি প্রবণতা আবিষ্কৃত হয়, প্রতিবিম্বিত হয়।

সৈয়দ শামসুল হক *ঈর্ষা* কাব্যনাটকে আধুনিক মানুষের ব্যক্তিচেতনার রসহ্য উন্মোচনে কাহিনীর আখ্যানভাগে মাত্র তিনটি চরিত্র ব্যবহার করেছেন। চরিত্র তিনটি তাদের ব্যক্তিগত চিন্তাচেতনার অন্তর্গত জটিলতা রহস্য অনুভূতি উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেছে। নাট্যকার কাব্যনাটকে কোন চরিত্রের নাম উল্লেখ করেননি, তবে তাদের পেশার উল্লেখ করেছেন। এদের দুজন পুরুষ, একজন নারী। তবে তিন জনই চিত্রশিল্পী। বয়সে প্রবীণ শিল্পীর ছাত্র অন্য দুজন। যুবতী যুবককে বিয়ে করায় নাট্যকাহিনীতে ঈর্ষার জন্ম হয়েছে। প্রৌঢ় শিল্পীর নিকট বিমূর্ত চিত্রকলার জ্ঞানার্জন করতে গিয়ে যুবতী প্রৌঢ়শিল্পীর সাথে দৈহিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। প্রবীণ চিত্রকর বিমূর্ত শিল্পকর্মে দক্ষ কিন্তু তিনি যুবতী ছাত্রীকে পেয়ে তিনি মূর্তশিল্প নির্মাণে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এর ফলে যুবতী তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যেতে বাধ্য হয়। যুবতী প্রথমদিকে শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ শরীরী সান্নিধ্যে এসে বিবেকের তাড়নায় ইতস্তত করেছে, কিন্তু একটা সময় তার নিজেরও শরীরী চাহিদা জেগে ওঠে। এ সময় যুবতী কৈশোরোত্তীর্ণ মেয়ের মতো প্রেম ও কামের শিহরণ অনুভব করে, বারবার শিক্ষকের নিকট ছুটে যায়। অন্যদিকে প্রবীণ চিত্রশিল্পী জীবনে অনেক নারীর সংসর্গ লাভ করায়, তার মধ্যে প্রেমের শিহরণের পরিবর্তে শুধুমাত্র শরীরী-ক্ষুধা জেগে থাকে। তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী শারীরিকভাবে ভোগের জন্য যুবতীকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তোলেন। এক পর্যায় প্রৌঢ়ের বাকচাতুর্যে প্রেমের আবেশে আবিষ্ট যুবতী সম্মোহিত হয়ে পড়ে এবং ধীরে-ধীরে তার দৈহিক সৌন্দর্য সে প্রৌঢ়ের সামনে খুলে দেয়। প্রৌঢ়শিল্পীর ইচ্ছানুযায়ী যুবতী

অসংখ্যবার নগ্ন হয়ে ‘সিটিং’[৩২] দেয়। এরপর প্রৌঢ়শিল্পী যুবতীর অনেক নগ্ন এবং মূর্তচিত্র এঁকেছেন। নগ্ন ছবি আঁকার সময় প্রৌঢ়ের সামনে যুবতীকে নগ্ন হয়ে সিটিং দিতে হয়েছে। এ সময় প্রৌঢ় এবং যুবতীর মধ্যে নারী পুরুষের সহজাত আকর্ষণে শরীরী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার– দেহমিলন সম্পূর্ণ জৈবিক ঘটনা; কিন্তু মানসিক সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে সময় অভিজ্ঞতা বুদ্ধি বিবেচনার নানা অনুষঙ্গ জড়িত। দৈহিক মিলনে যুবতীর জৈবিক সামর্থ্য থাকলেও বয়সের অনভিজ্ঞতার কারণে সে প্রৌঢ়ের মানস বিশ্লেষণে সক্ষম হয়নি। যুবতী-প্রৌঢ়ের এই অসম মানসিক অবস্থান তাদের সম্পর্কের মধ্যে একটি দেয়াল তুলে দেয়। এজন্য প্রৌঢ়কে যুবতী ভালোবাসা সত্ত্বেও হঠাৎ করে একদিন যুবককে বিয়ে করে। নাট্যঘটনায় মূলত প্রৌঢ়-যুবতীর এই মানস সংকট থেকেই ঈর্ষার সৃষ্টি হয়। কাব্যনাটকে একদিকে প্রৌঢ়ের গভীর ভালোবাসা অন্যদিকে যুবতীর শরীরকেন্দ্রিক অনভিজ্ঞ ভাবনার মধ্যে নাট্যসংঘাত নিহিত। প্রৌঢ়ের দৈহিক চাওয়ার সামনে যুবতীর নিজের সমর্পণকে সে মনে করে, নৈবেদ্যর অর্ঘ্য স্বরূপ। অর্থাৎ শিল্পের প্রতি যুবতীর অসীম অনুরাগ শ্রদ্ধা ভালোবাসা ছিল, তাই যুবতী তার শরীর অর্ঘ্য স্বরূপ প্রৌঢ়কে দান করেছে। যুবতী এজন্যই বিয়ে করেছিল যুবককে। যুবতীর বিয়ের ঘটনা প্রৌঢ়শিল্পী স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেননি। তিনি ঈর্ষান্বিত হয়েছেন। এই ঈর্ষা থেকে তিনি যুবতীকে ন্যুড ছবির প্রদর্শনের হুমকি দিয়েছেন। প্রৌঢ়ের হুমকির প্রেক্ষিতে যুবতী প্রতিবাদ করে। এরপর যুবতী প্রথম দিনের ঘটনা থেকে শুরু করে প্রৌঢ়ের সাথে তার দৈহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার ঘটনা সবিস্তারে নাট্যদর্শকের সামনে অসহায় আর্তিতে বর্ণনা করেছে :

> দেহহীন একটি হাত লিখে চলে ‘ভালোবাসা’ বারবার আমার দেয়ালে।
> হতে পারি নির্বোধ আমি, কিন্তু এটুকু তো জানি,
> আমি অনেক ভেবেছি, দেখেছি– এটা ঠিক নয়,
> বোকা আর গাধারাই শুধু ফেলে যায়, ঠিক নয় যারা ফেলে যায়
> তারা প্রেম নয়, ভালোবাসা নয়, দু’জনের ভেতরে দু’জন এতে বিশ্বাস করে না।
> বরং এটাই ঠিক, মানুষেরা বড় স্পষ্ট করে যখন দেখতে পায়
> প্রেম নয়, ভালোবাসা নয়, শুধু দেহ, শুধুই শরীর, শরীর,
> শরীরের জন্যে শুধু টান ছাড়া আর কোনো টান নয়,
> কেবল তখনই তারা ফেলে যায়। কালীগঙ্গা থেকে ফিরে আপনার কথা
> কেবলি ভেবেছি আর উত্তর খুঁজেছি; তারপর আপনার বারবার খবর পাঠানো–
> মনে হলো, মনে হয়েছিল, দরোজাটা খুলে গেছে, আপনি দাঁড়িয়ে;
> ভালোবেসে ফেলেছেন আপনি আমাকে।[৩৩]

যুবতীর প্রথম প্রেমানুভূতির বর্ণনায় তার মানসিক দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। সে প্রৌঢ়ের প্রতি কখনো শরীর আর কখনো মনের টান উপলব্ধি করে। যুবতী বুঝে উঠতে পারেনি যে, প্রৌঢ় সত্যিকার অর্থেই তাকে ভালোবাসেন কি-না। তথাপি শরীরের অনিবার্য আকর্ষণে প্রৌঢ়ের আহ্বানে যুবতী সাড়া দিয়েছে। মূলত যুবতী বয়সের অনভিজ্ঞতায় প্রৌঢ়ের ভালোবাসাকে শুধু শরীরী আকর্ষণ মনে করেছে। সম্ভবত এ কারণেই যুবককে বিয়ে করে যুবতী দেখতে চেয়েছিল প্রৌঢ়ের প্রেমজাত ঈর্ষা। *ঈর্ষা*য় মূলত ব্যক্তি মানুষের অভিজ্ঞতার জটিলতা এবং অন্তর্গত রহস্য উন্মোচনই নাট্যকারের লক্ষ্য। *ঈর্ষা*য় তিনটি চরিত্রের সংলাপে জীবনাভিজ্ঞান এবং

অনুভবের জারকরসে আধুনিক কবিতার শরীর নির্মাণ করেছেন সৈয়দ হক। কাব্যনাটকে চরিত্রের অন্তর্চেতনা প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখকের যে দায় থাকে, তা সম্পূর্ণভাবে *ঈর্ষা*য় প্রকাশ করেছেন সৈয়দ শামসুল হক।

ঈর্ষা কাব্যনাটকের প্রধান অভিব্যক্তি প্রৌঢ়শিল্পীর জীবনাভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রকাশিত। তবে আশৈশব শিল্পের প্রতি অনুরক্ত যুবতীকে ঘিরেই শিল্পীর অন্তর্জাগতিক জটিলতার রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। অন্য কথায় তাকে (যুবতীকে) কেন্দ্র করেই নাট্যকাহিনী আবর্তিত-বিকশিত হয়েছে। শিল্পের প্রতি অনুরাগ বশত যুবতী, প্রৌঢ়শিল্পীর সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করে। সে প্রকৃতার্থে তার কাছ থেকে শিল্পের নিগূঢ় পাঠ গ্রহণ করতে চেয়েছিল; কিন্তু প্রৌঢ় চিত্রশিল্পী যুবতীর প্রতি পূর্বেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ফলে শিল্পের পাঠ নিতে এসে, যুবতীর জীবনে এক ভিন্নতর অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়; যা এক সঙ্গে আনন্দের, ভয়ের এবং ঘৃণার। প্রবীণ শিল্পী পরিচয়ের প্রথম দিনেই যুবতীকে ব্রহ্মপুত্র নদী দেখার নাম করে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে নৌকার ওপর চুম্বন করেছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগে বিহ্বলা যুবতী তখন ভেবে নেয়, হয়তো নদীই তার ঠোঁট ভিজিয়ে দিয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, যুবতীর জীবনে প্রথম শারীরিক স্পর্শের অনুভূতি ঘটেছে। তাই সে আনন্দে শিহরণে আর ভয়ে বুঝে উঠতে পারে না, তার ভিতরে কী ঘটছে! প্রাথমিক পর্যায় শারীরিক স্পর্শে যুবতী খানিকটা ভয় পেয়েছে, ঘৃণাবোধ করেছে। শুধুমাত্র এসব কারণে সে কিছুদিন শিল্পীর সাথে দেখা করেনি, কিন্তু শেষপর্যন্ত সে পারেনি; বাধ ভাঙা স্রোতের প্রবল টানে এক সময় রাগ অভিমান ঝেড়ে ফেলে ঠিকই ফুলদানী কিনে নিয়ে প্রৌঢ়শিল্পীর সাথে সাথে দেখা করতে গেছে। এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যায়, যুবতী প্রাথমিক পর্যায় প্রেমের সরল স্বাভাবিক টানে প্রৌঢ়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তবে এখানে মনে রাখতে হয়, তার এই আকর্ষণের অন্যতম কারণ, প্রৌঢ়শিল্পীর শারীরিক স্পর্শ। অর্থাৎ যুবতীর শরীরী বাসনাকে জাগিয়ে দিয়েছেন প্রৌঢ়শিল্পী। তবে শরীরী উত্তাপ থাকলেও যুবতীর হৃদয়ে অবচেতনে জন্ম হয়েছে ভালোবাসার।

ছয়. ইতিহাসে নারী উপেক্ষিতা

সৈয়দ শামসুল হক *নারীগণ* (২০০৭) কাব্যনাটকে ঐতিহাসিক পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী সময় নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রাসাদ রমণীদের দুঃস্বপ্নময় জীবনালেখ্য উপস্থাপন করেছেন। কাব্যনাটকের স্থান মুর্শিদাবাদ হীরাঝিল প্রাসাদ। কাব্যনাটকের সব চরিত্রই নারী– শরিফুন্নেসা, আমিনা বেগম, লুৎফুন্নেসা, মুন্না, পায়েলি, ডালিম ও ঘষেটি বেগম। এছাড়া নাট্যকাহিনী উপস্থাপনের জন্য প্রহরীগণ, বাঁদীগণ ও চার কুতুব চরিত্রের কথা বলা হয়েছে। ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর তার প্রাসাদ নারীদের কথা কোনো ইতিহাসে বিবৃত হয়নি। অথচ এই নারীরাও ইতিহাসের এই দুঃসময়ের ভুক্তভোগী অংশীদার ছিল। ইতিহাসে বারবার যেভাবে নারী উপেক্ষিত হয়েছে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু সৈয়দ হক তাঁর শিল্পীমনের তুলিতে ইতিহাসের এই দুর্ভাগা নারীদের কথা *নারীগণ* কাব্যনাটকে তুলে ধরেছেন। চার কুতুবের ধারাবাহিক বর্ণনায় পলাশীর যুদ্ধ থেকে শুরু করে এর নেপথ্যের ঘটনাদিও উঠে আসে কাব্যনাটকে। কুতুবদের বর্ণনায় সৈয়দ হক তুলে ধরেন ঐতিহাসিক উপেক্ষার কথা:

রাজা আসে রাজা যায়।
স্মৃতির প্রচ্ছদপটে আঁকা শুধু রাজাদেরই মুখ।
তাদের কথাই শুধু লেখা থাকে প্রতিটি পৃষ্ঠায়।
নারীর কথা কে লেখে? কার মনে থাকে?
গর্ভে যারা ধরেছিল, জীবনসঙ্গিনী ছিল,
যারা ছিল সুখদুঃখভাগী–
ইতিহাসের বিস্মৃতি তারাই।[৩৪]

সিরাজদ্দৌলা পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীর জাফর পুত্র মীরনের হাতে বন্দী হয়ে জীবন দিয়েছে। কিন্তু তার পরিবারের নারীদের ভাগ্যে কী দুর্ভোগ অপেক্ষা করেছিল সে কথা সবাই এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু সৈয়দ হক নবাব পরিবারের নারীদের সেই দুঃস্বপ্নের কথা পরম মমতায় তুলে ধরে লিখেছেন :

গোরা সৈন্যদল আর সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ
স্ত্রীসঙ্গ বিহনে আছে বহুদিন।
আজ তারা অপেক্ষায় আছে
কখন শিবিরে পাবে প্রাচ্য নারীদের–
যাদের নাভিকে ওরা সন্তানের জন্মসূত্র নয়,
মনে করে কামচক্র ওটি।
যেন প্রাচ্য নারীদের স্তন নয় মাতৃদুধে–
কামনার সুরাপূর্ণ কোমল সোরাহি।[৩৫]

সৈয়দ শামসুল হক *নারীগণ* কাব্যনাটকে পরাজিত নবাবের নারীদের অসহায় জীবনকথা ব্যক্ত করেছেন। কাব্যনাটকের উদ্দেশ্যই উপেক্ষিত নারীজীবনের দুর্ভাগ্যের কথা তুলে ধরা। *নারীগণ* কাব্যনাটকের প্রধান চরিত্র শরিফুন্নেসা। তার সহযোগী গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র আলীবর্দী খানের কন্যা আমিনা বেগম ও নবাব সিরাজদ্দৌলা পত্নী লুৎফুন্নেসা। আলীবর্দী খানের বিধবা পত্নী শরিফুন্নেসা বন্দী হীরাঝিল প্রাসাদ থেকে মেয়ে আমিনা, পুত্রবধূ লুৎফুন্নেসাকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন সমগ্র কাব্যনাটক জুড়ে। তিনি মূলত একজন নারী হিসেবেই ঘসেটি বেগমের সহায়তা চেয়েছিলেন বিপদের দিনে। কিন্তু এর ফলে ঘসেটি বেগমও গ্রেফতার হয়ে হীরাঝিলে আশ্রয় পায়। পরিণামে সিরাজের শোকে শরিফুন্নেসা প্রাণ ত্যাগ করলে রাজপ্রাসাদের নারীদের বুড়িগঙ্গার ওপারে জিঞ্জিরা কেল্লায় নির্বাসিত করা হয়। কিন্তু সেখানে সিরাজকন্যা মুন্নাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যৎ ষড়যন্ত্রের উৎস শিকড়েই নিশ্চিহ্ন করার ব্যবস্থা করে কাব্যনাটকে কুতুবগণ জানায় :

ঢাকা থেকে বজরায় তোলা হবে সিরাজের মাতা আমিনাকে,
তোলা হবে লুৎফাকে, কন্যাকে, আর সেই ঘসেটিকে–
শত্রুপক্ষে গিয়েও রেহাই যিনি
পাননি, বন্দিনী হন, বজরায় তিনিও থাকবেন।
তারপর যাত্রাপথে ঢাকারই অদূরে
বজরার তল থেকে পাটাতন খুলে নেয়া হবে–
কলকল করে পানি ঢুকবে বজরায়–
বজরা সোয়ারিসহ বুড়িগঙ্গা নদীতে তলাবে।[৩৬]

নবাব সিরাজদ্দৌলার পরিবারের নারীদের এই পরিণতির ইঙ্গিত দিয়ে নাট্যকাহিনীর যবনিকা টেনেছেন সৈয়দ হক। *নারীগণ* কাব্যনাটকে সৈয়দ শামসুল হক ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে ইতিহাসের উপেক্ষিত নারীদের জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। বলাবাহুল্য, এ কাব্যনাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে নাট্যকার সৈয়দ হক অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কেননা পুরুষদের রচিত ইতিহাসে সাধারণত নারীর কথা থাকে না। যেমন, পলাশীর ট্র্যাজিক ঘটনায় সিরাজদ্দৌলার কথা নানাভাবে ইতিহাসে স্থান পেলেও পুরনারীদের কথা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক ইতিহাসের উপেক্ষিত সেইসব নারীদের মর্মান্তিক পরিণতির কথা তুলে ধরেছেন *নারীগণ* কাব্যনাটকে।

সাত. অপরাধীর বিচার হবেই

সৈয়দ শামসুল হক *উত্তরবংশ* (২০০৮) কাব্যনাটকে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে একাত্তর পরবর্তী প্রজন্মের করণীয় নির্দেশ করেছেন। *উত্তরবংশ* বলতে সৈয়দ হক একাত্তর সালের পরে যাদের জন্ম হয়েছে, তাদের বুঝিয়েছেন। এ দেশের সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় এ প্রজন্মের করণীয় কী হবে এবং হওয়া উচিত তার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে শিল্পিত প্রতিভাষ্য নির্মাণ করেছেন এ কাব্যনাটকে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে পূর্ব-পুরুষগণ যা করতে পারেনি, কিংবা তাঁরা যে ভুল করেছেন, সেই ভুলের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন কাব্যনাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক।

উত্তরবংশ কাব্যনাটকের কাহিনীর শুরু হয়েছে একাত্তরের পঁচিশে মার্চ রাতে পাক-বাহিনীর বর্বোরিত হত্যাযজ্ঞের ভয়াবহ দৃশ্যের বিবরণ দিয়ে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী নিরীহ মুক্তিকামী বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যার যে রাজনৈতিক পরিকল্পনা করেছিল সেই বিশ্বাসঘাতক রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন *উত্তরবংশ* কাব্যনাটকে। একাত্তরে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর লেলিয়ে দেয়া সৈন্যদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পূর্বাপর ব্যাখ্যা অভিজ্ঞ রাজনীতিকের মতো করে *উত্তরবংশ* কাব্যনাটকে শিল্পিত সুষমায় তুলে ধরেছেন। কাব্যনাটকের কাহিনীর শুরুতেই একাত্তরের হত্যাযজ্ঞের বিবরণ দিয়েছেন নাট্যকার: 'ধানমণ্ডি... ফায়ার!/ নাম্বার থার্টিটু... দ্য বিগ বার্ড... সারাউণ্ড দ্য হাউস!'[৩৭] সৈনিকের এ সংলাপে 'ধানমণ্ডি' উচ্চারণের সাথে সাথে দর্শকের সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে ঐ এলাকার ৩২ নম্বর বাড়ি; যেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাস করতেন। এছাড়াও অনুমান করা যায়, হানাদার বাহিনীর মূল লক্ষ্যও ছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার। অর্থাৎ একাত্তরের পঁচিশে মার্চের রাতেই যদি বাঙালির অবিসংবাদিত স্বাধিকার আন্দোলনের নেতা, অধিকার আদায়ের বজ্রকণ্ঠ বঙ্গবন্ধুকে ৩২ নম্বর বাড়িতেই চিরতরে নিস্তব্ধ করে দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল।

পাকহানাদার বাহিনী কর্তৃক নিরীহ বাঙালির ওপর আক্রমণের ঘটনাকে সৈয়দ শামসুল হক ধ্বনি-ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তোলার পর কাব্যনাটকের মূল কাহিনীতে প্রবেশ করেছেন। *উত্তরবংশ* কাব্যনাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন নাট্যকার; যিনি একটি নাটক লেখায় হাত দিয়েছেন এবং ইতোমধ্যে সে নাটকের দুটো দৃশ্যও লেখা হয়ে গেছে। কিন্তু দ্বিতীয় দৃশ্যের পর তিনি স্মৃতি বিভ্রাটের কারণে নাট্যকাহিনী এগিয়ে নিয়ে পারছেন না। এমতাবস্থায় নাট্যকার তাঁর মেয়ের নিকট থেকে আগে বলা তাঁর স্মৃতিচারণ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন যে, তার (মেয়ের)

মায়ের সাথে প্রথম সাক্ষাতের যে গল্প তিনি মেয়েকে শুনিয়েছিলেন তার সেকথা মনে আছে কিনা? কারণ, তিনি (নাট্যকার) কিছুতেই মনে করতে পারছেন না প্রথম সাক্ষাতের দিন তাঁর প্রেয়সীর (মেয়ের মায়ের) পরনে সাদা-জমিনের শাড়ির পাড়ের রং লাল নাকি নীল ছিল? মেয়ে তার পিতার নিকট থেকেই মা-বাবার প্রণয়-পরিণয়ের গল্প শুনেছিল। কিন্তু পিতা যখন শাড়ির পাড়ের রং কেমন ছিল, প্রশ্ন করেন তা মেয়েও বলতে ব্যর্থ হয়। নাট্যকারের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে তাঁর প্রেয়সীর পরনে সেদিন সাদা জমিনের লাল (রক্তলাল) রঙের শাড়ি পরেছিলেন। নাট্যকার তাঁর প্রেয়সীর শাড়ির পাড়ের রঙ নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে মূলত একটি প্রতীকী প্রতিভাস নির্মাণ করতে চান নাটকে।

বাংলাদেশের পতাকার রক্তলাল ধীরে ধীরে ফিকে হয়েছে। অর্থাৎ ক্রমাগত স্বাধীনতার মূল্যবোধ ম্লান হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় চার দশক পরেও আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারেনি। এ দেশের বার্ষিক বাজেট এখনো বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে। মেয়ে এজন্যই স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকার মাঝখানে রক্তলাল অংশে দেখে ভিখারির হাতের ময়লা থালার মতো। আমাদের অর্থনীতি চলে বৈদেশিক সাহায্য এবং ঋণের ওপর ভর করে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি বাংলাদেশ। এজন্য স্বাধীনতার প্রতীক রক্তলাল রঙের ভেতর নাট্যকার দেখেন নিষেধের সংকেতধ্বনি।

নাট্যকার নিজের মেয়েকে বোঝাতে চেয়েছেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্রমাগত এক বর্ধিষ্ণু সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ঘটছে। এই সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান নাট্যকার এবং তাঁর মেয়ের সংকটাপন্ন জীবনবাস্তবতার ইঙ্গিত প্রদান করে। স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় চার দশক পরে এসেও নাট্যকার আশঙ্কা করেছেন তিনি স্বাধীনতার বিরোধীর দ্বারা যেকোন সময় আক্রান্ত হতে পারেন। একাত্তরের ১৪ ডিসেম্বর যেভাবে স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার, আলবদর বাহিনী বাংলাদেশের লেখক বুদ্ধিজীবী তথা দেশের সূর্যসন্তানদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছিল ঠিক একইভাবে পুনরায় স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তারা আবারো এ দেশের লেখক বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পরিকল্পনা করছে। এই আশঙ্কা থেকেই নাট্যকার তাঁর মেয়ের কাছে নিজের জীবন সংশয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন :

> কখন ওরা কলমটা আমার কেড়ে নেয়।
> কখন ফুসফুস থেকে কেড়ে নেয় নিশ্বাস।
> কখন কবজি কেটে দেয়, কখন চোখ উপড়ে নেয়।[৩৮]

স্পষ্টভাবে সৈয়দ শামসুল হক এখানে 'ওরা' সর্বনাম পদের মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধী ধর্মসংস্কারাচ্ছন্ন মৌলবাদী শক্তির রাজনৈতিক সংগঠিত উত্থানের কথা ব্যক্ত করেছেন। সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শাক্তির রাজনৈতিক উত্থানে প্রগতিশীল নাট্যকার নাটকের চরিত্র এই মৌলবাদী গোষ্ঠীর আক্রমণের শিকার হওয়ার শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাব্যনাটকের নাট্যকার চরিত্রে প্রকৃতার্থে সৈয়দ হকের মানস প্রবণতা ফুটে উঠেছে। স্বয়ং কাব্যনাট্যকারই আশঙ্কা প্রকাশ করে তাই লেখেন : 'ওরা তো ওদের পরাজয় এখনো ভোলেনি!' অর্থাৎ একাত্তরের পরাজিত শক্তি পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে অতীত পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রস্তুতি নিয়েছে এবং তারই ধারাবাহিকতায় লেখক বুদ্ধিজীবীদের

দেশব্যাপী হত্যা শুরু হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা পর্যন্ত আজ আতঙ্কগ্রস্ত এই পুনর্গঠিত ধর্মান্ধ মৌলবাদী রাজনৈতিক শক্তির মোকাবেলায়। মেয়েকে নাট্যকার তাই বলেছেন, জনগণকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে তিনি যে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, তা পত্রিকা সম্পাদক ছাপতে পারেননি জীবনসংশয়ে। নাট্যকার তাঁর প্রবন্ধে মূলত ধর্ম এবং রাজনীতিকে পৃথক করে বিবেচনার কথা বলেছিলেন ঐ প্রবন্ধে। তারপর প্রগতিশীল মুক্তিযোদ্ধা, পত্রিকা-সম্পাদক নাট্যকারের সেই প্রবন্ধ মূলবক্তব্য বর্জন করে ছেপেছেন।

সৈয়দ শামসুল হক কাব্যনাটকে নাট্যকারের মেয়ে চরিত্রটিকে নির্মাণ করেছেন একাত্তর পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে। যে উত্তরপ্রজন্ম (মেয়ে) মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনেছে বাবার নিকট থেকে। বাবার নিকট থেকে শোনা একাত্তরের নৃশংসতা ও ভয়াবহতাকে মেয়ে ইতিহাস হিসেবে গ্রহণ করেনি, বরং মনে করেছে সেসব নাট্যকার পিতার শিল্পীমনের কল্পনা। মেয়ের এই বিশ্বাসবোধের পেছনে ক্রিয়াশীল আছে গভীর সামাজিক সত্য। কারণ, একাত্তরের নৃশংসাতার কথা মেয়ে পিতা ছাড়া সমাজের আর কারো কাছ থেকেই কখনো শোনেনি। পিতার কাছে শোনা ইতিহাস মেয়ের কাছে এতদিন ছিল কল্পকাহিনী; কিন্তু সমকালের বাস্তবতায় উত্থিত সন্ত্রাসবাদের মধ্যে মেয়ে যেন বাবার কাছে শোনা কল্পকাহিনীর বাস্তবতা অনুভব করেছে। ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের মধ্য দিয়ে বাবার কাছে শোনা ঘটনা সত্য হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে মেয়ে তথা উত্তরপ্রজন্ম দেখছে মুক্তিযোদ্ধাদের বর্তমান বাস্তবতা:

> দেশ-মানুষের পক্ষে এতকাল যারা করেছে রাজনীতি–
> মুক্তিযুদ্ধে ছিল সমুখের সারিতে যারা–
> তারাই যে ক্রমে এখন হয়ে পড়েছে কোণঠাসা!
> তাই নেতাদের এখন বুঝি অভিনেতা হবার ইচ্ছে।[৩৯]

মেয়ের এই উপলব্ধির সত্যতা মেলে নাট্যকার মমতাজউদদীন আহমদ-এর উচ্চারণে:

> আমি কি তেমন এজন ভাগ্যবান হবো, যে দুচোখ মেলে দেখে যেতে পারবো উদ্যানে সুবিশাল বিজয়স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। অভ্রংলিহ সেই স্তম্ভের শীর্ষে জ্বলজ্বল করে উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে। যতোদূরেই থাকি, সাভারে কি কাঁচপুর ব্রিজের কাছে, সেখান থেকেই যেন দেখতে পাই বিজয়ের মহতী বাতি জ্বলছে। ওইখানে আমার অহঙ্কার, আমার আকাঙ্ক্ষার বিজয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।[৪০]

কাব্যনাটকে সৈয়দ শামসুল হক উত্তরবংশের কাছে একাত্তরের নারকীয় তাণ্ডবলীলার ইতিকথা নাট্যকার চরিত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। নাট্যকার তাঁর মেয়ের কাছে একাত্তরের অনেক নৃশংসতার কথা জানালেও কখনো তার (মেয়ের) মায়ের আত্মহত্যার কারণ সম্বন্ধে কিছু বলেননি। বরং তিনি স্ত্রীর আত্মহত্যার করুণ ইতিকথা মেয়ের কাছে আড়াল করে রেখেছেন।

একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা দেশপ্রেমিক নেতা বসে নেই; মিছিল-মিটিং আর রাজপথের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে নেতা সক্রিয়ভাবে সংস্কৃতিকর্মী নাট্যকারকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ নেতা বিশ্বাস করেন, সংস্কৃতিকর্মীরাই তৈরি করে দেয় রাজনীতিকের ফসল তোলার মাঠ। সংস্কৃতিকর্মীর মাঠ তৈরি করে দিয়ে বীজ বপন করে দেয়; এবং সেই বীজের ফসল একদিন

ঘরে তুলে নিয়ে আসে নেতা। একাত্তরে যেমন নিয়ে এসেছিল স্বাধীনতা। দেশপ্রেমিক নেতা এজন্য সংস্কৃতিসেবক নাট্যকারকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

> তোমাদের লেখায় অভিনয়ে গানে তোমরা তৈরি করেছ জমি।
> রোপণ করেছ বীজ। হাজার বছরের ভাঁড়ার থেকে বীজ।
> আর আমরা রাজনীতির মানুষেরা তোমাদের বীজতলা থেকে
> চারা তুলে ফসল করেছি– স্বাধীনতা আমরা ঘরে তুলেছি।[৪১]

বাংলাদেশের সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতিকর্মী নাট্যকার নেতাকে বলেছেন, আজ তোমরা (নেতারা) আমাদের যে জমি আমাদের তৈরি করে দিতে বলছো, সেই জমির মালিকানাই বেদখল হওয়ার উপক্রম হয়েছে। নাট্যকারের একথার প্রতি-উত্তরে নেতা আশ্বাস দিয়েছেন– জমি এখনো বেদখল হয়নি। এটা মূলত নেতার আত্মপ্রসাদ হিসেবে উল্লেখ করে তাই নাট্যকার সমকালের প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। এমতাবস্থায় জমির মালিকানা দাবি আত্ম-প্রবঞ্চনার সামিল। বিরোধী মৌলবাদী রাজনীতিকদের পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল রাজনীতিবিদরা তো এক অর্থে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে! নাকি একাত্তরের পরাজিত শক্তির বোমাবাজি আর হত্যার হুমকির মুখে প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক রাজনীতিকগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন?

কাব্যনাটকের নেতা চরিত্রটি নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীন বাংলাদেশের সাংসদ হিসেবে জনপ্রতিনিধির দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন। দেশ ও জনসেবায় নিয়োজিত করেছেন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে। 'মানুষের মুখের হাসিটুকুই পুরস্কার' হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাই পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাস্তবতায় নেতা ভীত হননি। বরং দৃঢ় কণ্ঠে নেতা জানিয়েছেন সংস্কৃতিকর্মী নাট্যকারকে : 'দেশটার স্বপ্নই যখন নিহত, ব্যক্তিগত মৃত্যুর ভয়– তুচ্ছ।' মৌলবাদী ধর্মীয় রাজনৈতিক শক্তির উত্থানে নেতা পুনরায় সহায়তা কামনা করেছেন বন্ধু নাট্যকারের। কিন্তু নাট্যকর্মীর মেয়ের জিজ্ঞাসার মুখে নীরব পিতা রক্তাক্ত এবং ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। তবুও প্রজন্মের নিকট ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনা বা সত্য যতই নির্মম কিংবা নিষ্ঠুর হোক না-কেন তা উদ্ঘাটন করতে হবে। নেতা সেই প্রয়োজনীয়তা থেকেই নাট্যকারকে অনুরোধ করেছেন ইতিহাসের বাস্তব ঘটনাকে উপজীব্য করে নাটক রচনার জন্য। যাতে একাত্তরের পরবর্তী প্রজন্ম ইতিহাসের সত্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। অন্যদিকে মেয়ে নাট্যকার বাবাকে তাঁর পারিবারিক জীবনের সত্যকে তথা বাস্তবতাকে উপজীব্য করে নাটকটি রচনার। কারণ, মানুষের জীবন তো একটি নাটকই। মেয়ে মনে করে তাদের পারিবারিক জীবনেই লুকিয়ে একাত্তরের এক ভয়াবহ সত্য। কারণ, তার মা কেন সাড়ে তিন বছরের শিশুকে রেখে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল? ব্যক্তি জীবনের নির্মম করুণ ইতিকথা নেতাও বলেছেন বন্ধু নাট্যকারের কাছে। নেতা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সত্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি মূলত নাট্যকারকে তাঁর জীবনের সত্য নাট্যকাহিনীর মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য উৎসাহিত করেছেন। সংস্কৃতিকর্মীদের অক্ষম শিল্পাদর্শ বিভ্রান্ত করেছে দেশবাসীকে। ফলে উত্তরবংশ আর একাত্তরের ইতিহাস সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়েছে, কেউবা বিস্মৃত হয়েছে। এ দায় রাজনীতিক নেতার একার নয়। নেতাদের সাথে লেখক বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীসহ সকলেই নাট্যকারের স্ত্রীর আত্মহত্যার জন্য দায়ী।

নাট্যকার তাই শেষ পর্যন্ত অনুভব করেন, আমাদের অন্ধকার পথ থেকে আলোতে টেনে আনবার জন্যই কি তাঁর স্ত্রী সাড়ে তিন বছরের শিশু কন্যাকে ফেলে শরীরে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। মরতে মরতেও নাট্যকারের স্ত্রী ইতিহাস বিস্মৃত বাঙালি জাতিকে আলোর পথ দেখাতে চেয়েছিল।

উত্তরবংশ কাব্যনাটকের পরিণাম দৃশ্যে নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক তাই নেপথ্যে একাত্তরের শহীদ, ধর্ষিত নারী-মা-বোনদের কণ্ঠে বিচারের দাবি উত্থাপন করেছেন। কিন্তু এদের বিচার করবে কে? প্রগতিশীল নাট্যকারের মতো প্রায় সকলে তাদের ব্যক্তি-জীবনের ঘটনা ভুলতে চেয়েছে। তাই আজ দেশপ্রেমিক নেতাকে বোমার আঘাত থেকে কোন রকমে আত্মরক্ষা করে বন্ধুর ঘরে আশ্রয় নিতে হয়। বোমা আতঙ্কে সন্ত্রস্ত নেতাকে উদ্দেশ্য করে তাই নাট্যকারের মেয়ে উচ্চারণ করে : 'কিসের আপনার বেঁচে থাকা? আপনিও তো মৃত।' নেতা জীবনভয়ে পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছে সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায়। আর সংস্কৃতিকর্মী নাট্যকার রাজনীতিবিদের জন্য নতুন করে জমি তৈরি করার প্রয়াস গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু আমাদের এই পূর্বজরা কি পারবেন? উত্তরবংশ মনে করে– না, তারা আর পারবেন না! তাই উত্তর প্রজন্মের প্রতিনিধি নাট্যকারের মেয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে :

> আমরা আর সময়কে পার হয়ে যেতে দেব না।
> যে বিচার আপনারা করতে পারেননি, আমরাই করব।
> সময় এখনো বহে যায়নি, বিচারে তাদের তুলব।[৪২]

উত্তর প্রজন্মের কণ্ঠে পাওয়া যায় দৃঢ়তা বলিষ্ঠতা। একাত্তরের অপরাধীদের বিরুদ্ধে সচেতনতার ইঙ্গিতধ্বনি শোনা গেলেও কীভাবে তারা এই বিচার কার্য শুরু করবে, তার কোনো উপায় নির্দেশ করতে পারেনি নাট্যকারের মেয়ে। তবে নাট্যকার পিতার নিকট মেয়ে যে দৃঢ় সংকল্পের ঘোষণা করেছে তার মধ্য দিয়ে একাত্তরের তথা বাংলাদেশের অতীত ইতিহাসের সত্য উদ্ঘাটনের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। উত্তরবংশ বা উত্তর প্রজন্মের নিকট বর্তমান বাস্তবতায় একাত্তরের অপরাধীদের বিচারের অনিবার্যতা এবং দৃঢ়তার কথা এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। আর তাই একটি উপায় স্বরূপ মেয়ে তার নাট্যকার পিতাকে নাটকটি লেখার অনুরোধ করেছে।

সুতরাং নাট্যপরিণামে সৈয়দ শামসুল সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে উত্তরণের উপায় স্বরূপ একজন বঙ্গবন্ধুর মতো নেতার কামনা করেছেন। এখন শুধুই তাহলে কি অপেক্ষার পালা? এজন্য আমি মনে করি, সকলেই তাদের স্ব-স্ব অবস্থান থেকে জগজ্জীবন আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতার বিচার করে। অতএব বঙ্গবন্ধুর মতো এক সূর্য-সন্তানকে ছাড়া বাংলাদেশের মানুষ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না। উত্তরবংশ কাব্যনাটকে নাট্যকার *উত্তরবংশ* তথা উত্তর-প্রজন্মের কাঁধের ওপর অনাকাঙ্ক্ষিত দায়ভার চাপিয়ে দিয়ে আরো একবার সংগ্রামী চেতনায় সমগ্র বাঙালি জাতিকে জেগে ওঠার আহ্বান জনিয়েছেন।

পরিশেষ

সৈয়দ শামসুল হক রচিত কাব্যনাটকের পর্যালোচনায় দেখা যায়, তাঁর কাব্যনাটকের বিষয় বিন্যাসে আঙ্গিকরীতিতে মৌলপ্রবণতা হিসেবে দেশপ্রেম রাজনীতি ইতিহাস ঐতিহ্য সাংস্কৃতি

চেতনা প্রাধান্য পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের সূচনা বা যাত্রা শুরু হয়, মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে। 'স্বাধীনতার মতো দীপ্র একটি শব্দের জন্যে যেন এতকাল ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আমাদের নাট্য অভিপ্রায়কে।'[৪৩] সৈয়দ শামসুল হকেরও নাট্যচর্চার শুরু স্বাধীনতা উত্তরকালে। অবশ্য সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে বিচরণের প্রয়াস তাঁর মধ্যে প্রথমাবধিই ছিল। বিশেষভাবে নাটক রচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> ভাষা মাধ্যমে নাটক আমার সবশেষের সংসার; অথচ, এখন পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই, নাটকের জন্য আমি তৈরি হয়ে উঠছিলাম সেই ছোটবেলায় বালকের বিস্ময় নিয়ে লেখা ভোরের শেফালী ফুল আর দেয়ালে ঝোলানো বিবর্ণ তাজমহল বিষয়ে দু'টি পদ্য রচনারও বহু আগে– আগে এমনকি আমার এই আমিকে অনুভব করে উঠবার।[৪৪]

অর্থাৎ নাটক রচনার আকাঙ্ক্ষা কিংবা প্রস্তুতি সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যজীবনের শুরু থেকেই ছিল। তাঁর নাট্যরচনার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার সার্থক প্রতিফলন ঘটায় বাংলাদেশের সাহিত্যে সার্থক কাব্যনাটক রচিত হয়। বাংলা সাহিত্যে কাব্যনাটকের জন্ম হয়েছে কবিতার প্রশস্ত আঙিনার মধ্য দিয়ে। কবিতার মধ্য দিয়ে বাংলা কাব্যনাটকের বিকাশ ঘটলেও সৈয়দ হকের রচনায় নাট্যগুণের সুসমন্বয় ঘটেছে। বাংলাদেশের সাহিত্যে সফল মঞ্চায়নযোগ্য কাব্যনাটক রচনায় সৈয়দ হকের তুলনা নেই। কাব্যনাটক রচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> অনেক দিক থেকেই আমার মনে হচ্ছিল যে এই বর্তমানে, বাংলা ভাষায়, খণ্ড কবিতার সব সম্ভাবনা আপাতত আমরা আবিষ্কার করে ফেলেছি, এখন একে কিছু দিনের জন্য পাশে রেখে অন্যদিকে মুখ ফেরানো প্রয়োজন– হতে পারে মহাকাব্য, কথাকাব্য কিংবা কাব্যনাট্য।[৪৫]

সৈয়দ শামসুল হক বাংলা কাব্যনাটক রচনার সময় ইউরোপীয় শক্তিমান কবি এবং কাব্যনাটকের জনক টি এস এলিয়ট কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছেন তবে শেষপর্যন্ত তিনি এ দেশের প্রেক্ষাপটেই বাংলা কবিতার নতুন এক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে দিয়ে মঞ্চায়নযোগ্য সার্থক কাব্যনাটক রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলশ্রুতিতে সৈয়দ শামসুল হকের রচিত কাব্যনাটকে এ দেশের মাটিলগ্ন মানুষের জীবন এবং তাদের সংগ্রামের ইতিহাস ঐতিহ্য অবলীলায় অকৃত্রিমভাবে চিত্রিত হয়েছে। সোজা কথায়, সৈয়দ হকের শিল্পমানসে কাব্যনাটক রচনার সময় বাঙালি সমাজের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্থান করে নিয়েছে। ফলে তাঁর রচিত কাব্যনাটকে বাঙালি জাতিসত্তার ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে আধুনিক জীবনের নানামুখী সংকট প্রতিফলি হয়েছে।

তথ্যসূচি:

---

১ 'এ দেশের আট কোটি লোক মুক্তিযুদ্ধ নেপথ্যেই দেখেছে।' –সাপ্তাহিক 'রোববার', ৩য় বর্ষ : ৪৮শ সংখ্যা, ঢাকা : ২২ মার্চ, ১৯৮১; পৃ.২৩

২ সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাটকের কাহিনীর পরিণতিতে আমরা অবশ্য পাকিস্তানপন্থী গ্রামের তথাকথিত রক্ষাকর্তা মাতবরের মেয়ের করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে তার রাজনৈতিক ব্যর্থতা লক্ষ করি। একইভাবে সফোক্লিসের ইডিপাস নাটকে থীবির অধিবাসীরাও তাদের রক্ষাকর্তা পরম শক্তিশালী রাজা ইডিপাসের ট্র্যাজিক পরিণতি দেখেছে। এই বিচারে 'ইডিপাস' এবং 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' যথেষ্ট

সাদৃশ্যপূর্ণ। অবশ্য সৈয়দ শামসুল হক নিজেও কাব্যনাট্যকে রচনার আগে গ্রীক এবং শেক্সপীয়রীয় নাটকে তাঁর আকর্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন। –সৈয়দ শামসুল হক, কাব্যনাট্য সংগ্রহ, ১ম প্র, ঢাকা: বিদ্যাপ্রকাশ, ১৯৯১; পৃ. ভূমিকা

৩ কাব্যনাট্য সংগ্রহ [পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়], পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৬

৪ তদেব, পৃ. ৩৭

৫ তদেব, পৃ. ৪২

৬ তদেব, পৃ. ৫৪

৭ 'সে সময় একটা নির্মম স্বীকারোক্তি করে মাতবর। তার বাবার উজ্জ্বল আদর্শ সে গ্রহণ করতে পারে নি। নাট্যকার সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের মাধ্যমে বলেন এ কথা। বাবার রেখে যাওয়া একটা চন্দন কাঠের বাক্স ছিলো। মাতবর তা কখনো খুলতে পারেনি। তার চাবি ছিল না তার কাছে। অর্থাৎ বাবাকে বোঝার মতো বোধ তার কখনও জন্মায়নি।' –তদেব, পৃ. ৩৭

৮ তদেব, পৃ. ৫৪

৯ সৈয়দ শামসুল হক 'গণনায়ক'-এর রচনাকাল জানিয়েছেন, ১৩ই জুন ১৯৭৫ থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ সাল। এ সময়সীমায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড 'মুজিবহত্যা' সংঘটিত হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট। এখানে মনে রাখা দরকার যে, মুজিব-হত্যার পূর্বেই সৈয়দ শামসুল হক 'গণনায়ক' লিখতে শুরু করেছিলেন; তখন তাঁর সামনে ছিল শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার'। কিন্তু তাঁর এই কাব্যনাটক লেখা শেষ হওয়ার আগেই তিনি নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখেন এবং প্রবলভাবে আলোড়িত, প্রভাবিত হন। সুতরাং একথা ঠিক যে, সৈয়দ শামসুল হক প্রাথমিক পর্যায়ে 'জুলিয়াস সীজার' সামনে রেখেই 'গণনায়ক' রচনায় হাত দিয়েছিলেন সত্য এবং পরবর্তী সময় [১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট] বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার ঘটনাটিও তাঁকে নিঃসন্দেহে কাব্যনাটকের উপাদান জুগিয়েছিল।

১০ সৈয়দ শামসুল হক, কাব্যনাট্য সংগ্রহ [গণনায়ক], পূর্বোক্ত; পৃ. ২১২ [সবিনয় নিবেদন]

১১ 'গণনায়ক' কাব্যনাটকের রচনার প্রেক্ষাপট-প্রসঙ্গ সম্বন্ধে রামেন্দু মজুমদার সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন যে, সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটকটি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পটভূমিতেই রচনা করেছিলেন। –দ্র. রামেন্দু মজুমদার, 'বাংলাদেশের মঞ্চনাটক', কায়সুল হক সম্পাদিত, শৈলী, ১ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা, ঢাকা: ১৬ নভেম্বর, ১৯৯৫; পৃ.১৫

১২ মোস্তফা তারিকুল আহসান, সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য, ১ম প্র, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৪; পৃ. ১০৭

১৩ সৈয়দ শামসুল হক, কাব্যনাট্য সংগ্রহ [গণনায়ক], পৃ. ২২২

১৪ তদেব, পৃ. ২৩৫

১৫ তদেব, পৃ. ২৫৩

১৬ গণনায়ক ওসমান এবং শেক্সপীয়রের সিজার চরিত্রের মৃত্যু একইভাবে সংঘটিত হয়েছে, তাছাড়া উভয় চরিত্রের বক্তব্যেও যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। যেহেতু নাট্যকার কাব্যনাটকের পটভূমি এ দেশীয় কাহিনী থেকে গ্রহণ করেছেন; সেহেতু ভাবা যেতে পারে, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ভিত্তিতেই নাট্যকার 'গণনায়ক' কাব্যনাটক লিখেছিলেন। –রামেন্দু মজুমদার, 'বাংলাদেশের মঞ্চনাটক', পৃ. ১৫

১৭ নাট্যকার 'গণনায়ক' কাব্যনাটকে ওসমানকে 'দেশনেতা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। উপরন্তু ষড়যন্ত্রকারীচক্র হুমায়ুন-সানাউল্লাহ রাজধানী থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর সেনাবাহিনী প্রধান যখন তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে, তখন শেখ মুজিবর রহমানের ব্যবহৃত 'মুজিব কোট'কে নাট্যকার 'ওসমানী কোট' আখ্যা দিয়েছেন। তাছাড়া নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে জনগণ ওসমানের পক্ষে 'রাষ্ট্রপিতা' বলে যে স্লোগান দিয়েছে, তার মধ্য দিয়েও বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়া কাব্যনাটকে রাষ্ট্রপতি ওসমানের ব্যক্তিগত সহকারী রশীদ আলির বক্তব্যেও তাকে 'বঙ্গবন্ধু' হিসেবে সনাক্ত করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

১৮ 'Conection as a necessary condition of dramatic charactersation of course, implies the most carefully considered emphasis upon the qualities which have to be brought into relief.' –W.H. Hudson, An Introduction to the Study of Literature, Reprint, London and Edinburgh : George G. Harrap & Co. Ltd., 1965; P. 188

১৯ রামবসু, 'কাব্যনাটক', তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা, ১ম প্র, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৪; পৃ. ৩০৩

[২০] 'বস্তুত কি বাংলাদেশ এখন বিভক্ত নয় দুটি শ্রেণীতে?– ব্যবহর্তা আর ব্যবহৃত। এবং বস্তুত কি ব্যবহৃত মানুষেরাই প্রায় সমগ্র জনগোষ্ঠি নয়? এবং ব্যবহর্তা মাত্র কতিপয়?' –সৈয়দ শামসুল হক, কাব্যনাট্য সংগ্রহ [এখানে এখন], পূর্বোক্ত; পৃ. ১৪২ [সবিনয় নিবেদন]

[২১] দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, ৫ম সং, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯২; পৃ. ১৪১

[২২] কাব্যনাট্য সংগ্রহ [এখানে এখন], পূর্বোক্ত; পৃ. ১৭৫

[২৩] তদেব, পৃ. ১৮১

[২৪] তদেব, পৃ. ১৫৯

[২৫] সৈয়দ শামসুল হক 'নূরলদীনের সারাজীবন' কাব্যনাটকের শেষে রচনাকাল ৯ই জানুয়ারি থেকে ১২ই মে ১৯৮২ সাল উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ কাব্যনাটকের 'সবিনয় নিবেদন' অংশে তিনি ৫ই নভেম্বর, ১৯৮২ লিখেছেন। অর্থাৎ কাব্যনাটকটি রচনার প্রায় ছয় মাস পরে প্রকাশিত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। –দ্র. কাব্যনাট্য সংগ্রহ [নূরলদীনের সারাজীবন], পূর্বোক্ত; পৃ. ৫৮ ও ১৪০

[২৬] ÔA party of sepoys under lieutenant Macdonald marched to the North against the principal body of the insurgents and decisive engagement was sought near patgram in February 1783.ÕÑ Bangladesh District Gazetteer's Rangpur, Edited by Nurul Islam Khan, Dhaka : Bangladesh Government press, 1977; P. 45

[২৭] কাব্যনাট্য সংগ্রহ [নূরলদীনের সারাজীবন], পূর্বোক্ত; পৃ. ৬০

[২৮] তদেব, পৃ. ১১১

[২৯] উত্তম দাশ, কাব্যনাট্য, ১ম প্র, দক্ষিণ ২৪ পরগণা: মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, ১৯৮৯; পৃ. ১২

[৩০] কাব্যনাট্য সংগ্রহ [নূরলদীনের সারাজীবন], পূর্বোক্ত; পৃ. ১৩৫

[৩১] সৈয়দ শামসুল হক, কাব্যনাট্য সংগ্রহ [ঈর্ষা], পূর্বোক্ত; পৃ. ২৮৪ [সবিনয় নিবেদন]

[৩২] 'সিটিং' ইংরেজি শব্দ। এর অর্থ– একটানা কোন কাজের সময়। এখানে চিত্রীর সামনে প্রতিকৃতির 'মডেল' বা নমুনা স্বরূপ একটা বসে থাকার ব্যাপার বোঝান হয়েছে।

[৩৩] কাব্যনাট্য সংগ্রহ [ঈর্ষা], পূর্বোক্ত; পৃ. ২৯৯

[৩৪] সৈয়দ শামসুল হক, নারীগণ, ১ম প্র, ঢাকা: কাগজ প্রকাশন, ২০০৭; পৃ. ১৬

[৩৫] নারীগণ, পূর্বোক্ত; পৃ. ১৭

[৩৬] তদেব,পৃ.৭৭

[৩৭] সৈয়দ শামসুল হক, উত্তরবংশ, সাজ্জাদ শরিফ সম্পাদিত, প্রথম আলো ঈদসংখ্যা, ঢাকা: সেপ্টেম্বর, ২০০৮; পৃ. ৩৩৮

[৩৮] উত্তরবংশ, পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৪০

[৩৯] তদেব, পৃ. ৩৪১

[৪০] মমতাজউদদীন আহমদ, 'আমার স্বপ্নের বিজয়স্তম্ভ দেখতে চাই', ঢাকা: যায়যায়দিন, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৮; পৃ. ৬ [উপসম্পাদকীয়]

[৪১] উত্তরবংশ, পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৪২

[৪২] তদেব, পৃ. ৩৫৪

[৪৩] আতাউর রহমান, নাট্য প্রবন্ধ বিচিত্রা, ১ম প্র, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫; পৃ. ১৭

[৪৪] কাব্যনাট্য সংগ্রহ, পৃ. ভূমিকা

[৪৫] তদেব।